চাঁদের পাহাড়

‘খুকুকে দিলাম’

চাঁদের পাহাড় কোনও ইংরিজি উপন্যাসের অনুবাদ নয়, বা ঐ শ্রেণীর কোনও বিদেশী গল্পের ছায়াবলম্বনে লিখিত নয়। এই বইয়ের গল্প ও চরিত্র আমার কল্পনাপ্রসূত।।

তবে আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলের ভৌগোলিক সংস্থান ও প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনাকে প্রকৃত অবস্থার অনুযায়ী করবার জন্য আমি স্যার এইচ. এইচ. জনস্টন, রোসিটা এরব্‌স্ প্রভৃতি কয়েকজন বিখ্যাত ভ্রমণকারীর গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করেছি।

প্রসঙ্গক্রমে বলতে পারি যে, এই গল্পে উল্লিখিত রিখটারস্‌ভেল্ড পর্বতমালা মধ্য-আফ্রিকার অতি প্রসিদ্ধ পর্বতশ্রেণী, এবং ডিঙ্গোনেক (রোডেসিয়ন মনস্টার) ও বুনিপের প্রবাদ জুলুল্যান্ডের বহু অরণ্য অঞ্চলে আজও প্রচলিত।

সেন্টফ্রাঙ্কো সৌর স্তোত্রের অনুবাদটি স্বর্গীয় মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় কৃত।

—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বারাকপুর, যশোহর
১লা আশ্বিন ১৩৪৪

এক

শঙ্কর একেবারে অজ পাড়াগাঁয়ের ছেলে। এইবার সে সবে এফ্. এ পাশ দিয়ে এসে গ্রামে বসেছে। কাজের মধ্যে সকালে বন্ধুবান্ধবদের বাড়ীতে গিয়ে আড্ডা দেওয়া, দুপুরে আহারান্তে লম্বা ঘুম, বিকেলে পালঘাটের বাঁওড়ে মাছ ধরতে যাওয়া। সারা বৈশাখ এভাবে কাটবার পরে একদিন তার মা ডেকে বললেন—শোন্ একটা কথা বলি শঙ্কর। তোর বাবার শরীর ভাল নয়। এ অবস্থায় আর তোর পড়াশুনো হবে কি করে? কে খরচ দেবে ? এইবার একটা কিছু কাজের চেষ্টা দেখ্।

মায়ের কথাটা শঙ্করকে ভাবিয়ে তুললে। সত্যিই তার বাবার শরীর আজ ক'মাস থেকে খুব খারাপ যাচ্ছে। কলকাতার খরচ দেওয়া তাঁর পক্ষে ক্রমেই অসম্ভব হয়ে উঠছে। অথচ করবেই বা কি শঙ্কর ? এখন কি তাকে কেউ চাকরি দেবে ? চেনেই বা সে কাকে ?

আমরা যে সময়ের কথা বলছি, ইউরোপের মহাযুদ্ধ বাধতে তখনও পাঁচ বছর দেরি। ১৯০৯ সালের কথা। তখন চাকরির বাজার এতটা খারাপ ছিল না। শঙ্করদের গ্রামের এক ভদ্রলোক শ্যামনগরে না নৈহাটীতে পাটের কলে চাকরি করতেন। শঙ্করের মা তাঁর স্ত্রীকে ছেলের চাকরির কথা বলে এলেন। যাতে তিনি স্বামীকে বলে শঙ্করের জন্যে পাটের কলে একটা কাজ যোগাড় করে দিতে পারেন। ভদ্রলোক পরদিন বাড়ী বয়ে বলতে এলেন যে শঙ্করের চাকরির জন্যে তিনি সাধ্যমত চেষ্টা করবেন।

শঙ্কর সাধারণ ধরনের ছেলে নয়। স্কুলে পড়বার সময় সে বরাবর খেলাধুলোতে প্রথম হয়ে এসেছে। সেবার মহকুমার এগজিবিশনের সময় হাইজাম্পে সে প্রথম স্থান অধিকার করে মেডেল পায়। ফুটবলে অমন সেন্টার ফরওয়ার্ডও অঞ্চলে তখন কেউ ছিল না। সাঁতার দিতে তার জুড়ি খুঁজে মেলা ভার। গাছে উঠতে, ঘোড়ায় চড়তে, বক্সিং-এ সে অত্যন্ত নিপুণ। কলকাতায় পড়বার সময় ওয়াই. এম. সি. এ.-তে সে রীতিমত বক্সিং অভ্যাস করেছে। এই সব কারণে পরীক্ষায় সে তত ভাল করতে পারেনি, দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছিল।

কিন্তু তার একটি বিষয়ে অদ্ভুত জ্ঞান ছিল। তার বাতিক ছিল যত রাজ্যের ম্যাপ ঘাঁটা ও বড় বড় ভূগোলের বই পড়া। ভূগোলের অঙ্ক কষতে সে খুব মজবুত। আমাদের দেশের আকাশে যে-সব নক্ষত্রমণ্ডল ওঠে, তা সে প্রায় সবই চেনে—ওটা কালপুরুষ, ওটা সপ্তর্ষি, ওটা ক্যাসিওপিয়া, ওটা বৃশ্চিক, কোন্ মাসে কোন্টা ওঠে, কোন্দিকে ওঠে—সব ওর নখদর্পণে। আকাশের দিকে চেয়ে তখনি বলে দেবে। আমাদের দেশের বেশী ছেলে যে এসব জানে না, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে।

এবার পরীক্ষা দিয়ে কলকাতা থেকে আসবার সময়ে সে একরাশ ওই সব বই কিনে এনেছে, নির্জনে বসে প্রায়ই পড়ে আর কি ভাবে ওই জানে। তার পর এল তার বাবার অসুখ, সংসারের দারিদ্র্য এবং সঙ্গে সঙ্গে মায়ের মুখে পাটকলে চাকরি নেওয়ার জন্যে অনুরোধ। কি করবে সে? সে নিতান্ত নিরুপায়। মা-বাপের মলিন মুখ সে দেখতে পারবে না। অগত্যা তাকে পাটের কলেই চাকরি নিতে হবে। কিন্তু জীবনের স্বপ্ন তা হলে ভেঙে যাবে, তাও সে যে না বোঝে এমন নয় ! ফুটবলের নামকরা সেন্টার ফরওয়ার্ড, জেলার হাইজাম্প চ্যাম্পিয়ন, নামজাদা সাঁতারু শঙ্কর হবে কিনা শেষে পাটের কলের বাবু ? নিকেলের বইয়ের আকারের কৌটোতে খাবার কি পান নিয়ে ঝাড়ন পকেটে করে তাকে সকালের ভোঁ বাজতেই ছুটতে হবে কলে—আবার বারোটার সময় এসে দুটো খেয়ে নিয়েই আবার রওনা—ওদিকে সেই ছ'টার ভোঁ বাজ্‌লে ছুটি। তার তরুণ তাজা মন এর কথা ভাবতেই পারে না যে ! ভাবতে গেলেই তার সারা দেহ-মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে—রেসের ঘোড়া শেষকালে ছ্যাক্‌ড়া গাড়ী টানতে যাবে ?....সন্ধ্যার বেশী দেরি নেই। নদীর ধারে নির্জনে বসে বসে শঙ্কর এই সব কথাই ভাবছিল। তার মন উড়ে যেতে চায় পৃথিবীর দূর, দূর দেশে—শত দুঃসাহসিক কাজের মাঝখানে। লিভিংস্টোন, স্ট্যান্‌লির মত, হ্যারি জন্‌স্টন্, মার্কো পোলো, রবিন্‌সন্ ক্রুসোর মত। এর জন্যে ছেলেবেলা থেকে সে নিজেকে তৈরী করেছে—যদিও এ কথা ভেবে দেখেনি অন্যদেশের ছেলেদের পক্ষে যা ঘট্‌তে পারে, বাঙালীর ছেলের পক্ষে তা ঘটা এক রকম অসম্ভব। তারা তৈরী হয়েছে কেরানী, স্কুলমাস্টার, ডাক্তার বা উকিল হবার জন্যে। অজ্ঞাত অঞ্চলের অজ্ঞাত পথে পাড়ি দেওয়ার আশা তাদের পক্ষে নিতান্তই দুরাশা।

প্রদীপের মৃদু আলোয় সেদিন রাত্রে সে ওয়েস্টমার্কের বড় ভূগোলের বইখানা খুলে পড়তে বসল। এই বইখানার একটা জায়গা তাকে বড় মুগ্ধ করে। সেটা হচ্ছে প্রসিদ্ধ জার্মান ভূপর্যটক আন্টন্ হাউপ্টমান্ লিখিত আফ্রিকার একটা বড় পর্বত—মাউন্‌টেন্ অফ দি মুন (চাঁদের পাহাড়) আরোহণের অদ্ভুত বিবরণ ! কত বার সে এটা পড়েছে। পড়বার সময় কতবার ভেবেছে হের্ হাউপ্টমানের মত সেও একদিন যাবে মাউন্‌টেন্ অফ দি মুন্ জয় করতে। স্বপ্ন ! সত্যিকার চাঁদের পাহাড়ের মতই দূরের জিনিস হয়ে থাকবে চিরকাল।....চাঁদের পাহাড় বুঝি পৃথিবীতে নামে ?

সে রাত্রে বড় অদ্ভুত একটা স্বপ্ন দেখলে সে।....

চারধারে ঘন বাঁশের জঙ্গল। বুনোহাতীর দল মড়্‌মড়্‌ করে বাঁশ ভাঙছে। সে আর একজন কে তার সঙ্গে, দুজনে একটা প্রকাণ্ড পর্বতে উঠছে ; চারিধারের দৃশ্য ঠিক হাউপ্টমানের লেখা মাউন্‌টেন্‌ অফ দি মুনের দৃশ্যের মত। সেই ঘন বাঁশবন, সেই পরগাছা ঝোলোনো বড় বড় গাছ, নীচে পচাপাতার রাশ, মাঝে মাঝে পাহাড়ের খালি গা—আর দূরে গাছপালার ফাঁকে জ্যোৎস্নায় ধোয়া সাদা ধব্‌ধবে চিরতুষারে ঢাকা পর্বত-শিখরটি—এক একবার দেখা যাচ্ছে, এক একবার বনের আড়ালে চাপা পড়ছে। পরিষ্কার আকাশে দু-একটি তারা এখানে ওখানে। একবার সত্যিই সে যেন বুনো হাতীর গর্জন শুনতে পেল। সমস্ত বনটা কেঁপে উঠল....এত বাস্তব বলে মনে হল সেটা, যেন সেই ডাকেই তার ঘুম ভেঙে গেল ! বিছানার উপর উঠে বসল, ভোর হয়ে গিয়েছে, জানলার ফাঁক দিয়ে দিনের আলো ঘরের মধ্যে এসেছে।

উঃ, কি স্বপ্নটাই দেখেছে সে! ভোরের স্বপ্ন নাকি সত্যি হয় ! বলে তো অনেকে।

অনেকদিন আগেকার একটা ভাঙা পুরোনো মন্দির আছে তাদের গাঁয়ে। বারোভুঁইয়ার এক ভুঁইয়ার জামাই মদন রায় নাকি প্রাচীন দিনে এই মন্দির তৈরী করেন। এখন মদন রায়ের বংশে কেউ নেই। মন্দির ভেঙেচুরে গিয়েছে, অশথ গাছ, বট গাছ গজিয়েছে কার্নিসে—কিন্তু যেখানে ঠাকুরের বেদী, তার ওপরের খিলেনটা এখনও ঠিক আছে। কোন মূর্তি নেই, তবুও শনি-মঙ্গলবারে পুজো হয়, মেয়েরা বেদীতে সিঁদুর চন্দন মাখিয়ে রেখে যায়, সবাই বলে ঠাকুর বড় জাগ্রত—যে যা মানত করে তাই হয়। শঙ্কর সেদিন স্নান করে উঠে মন্দিরের একটা বটের ঝুরির গায়ে একটা ঢিল ঝুলিয়ে কি প্রার্থনা জানিয়ে এল।

বিকেলে সে গিয়ে অনেকক্ষণ মন্দিরের সামনে দূর্বাঘাসের বনে বসে রইল। জায়গাটা পাড়ার মধ্যে হলেও বনে ঘেরা, কাছেই একটা পোড়ো বাড়ী ; এদের বাড়ীতে একটা খুন হয়ে গিয়েছিল শঙ্করের শিশুকালে— সেই থেকে বাড়ীর মালিক এ গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র বাস করছেন। সবাই বলে জায়গাটায় ভূতের ভয়। একা বড় কেউ এদিকে আসে না। শঙ্করের কিন্তু এই নির্জন মন্দির-প্রাঙ্গণের নিরালা বনে চুপ করে বসে থাকতে বড় ভাল লাগে !

ওর মনে আজ ভোরের স্বপ্নটা দাগ কেটে বসে গিয়েছে। এই বনের মধ্যে বসে শঙ্করের আবার সেই ছবিটা মনে পড়ল—সেই মড়মড় করে বাঁশঝাড় ভাঙছে বুনোহাতীর দল, পাহাড়ের অধিত্যকার নিবিড় বনে পাতালতার ফাঁকে ফাঁকে অনেক উঁচুতে পর্বতের জ্যোৎস্নাপাণ্ডুর তুষারাবৃত শিখরদেশটা যেন কোন স্বপ্নরাজ্যের সীমা নির্দেশ করছে। কত স্বপ্ন তো সে দেখেছে জীবনে—এত সুস্পষ্ট ছবি স্বপ্নে সে দেখেনি কখনো—এমন গভীর রেখাপাত করেনি কোনো স্বপ্ন তার মনে।....

সব মিথ্যে। তাকে যেতে হবে পাটের কলে চাকরি করতে। তাই তার ললাট-লিপি নয় কি ?....

কিন্তু মানুষের জীবনে এমন সব অদ্ভুত ঘটনা ঘটে তা উপন্যাসে ঘটাতে গেলে পাঠকেরা বিশ্বাস করতে চাইবে না, হেসেই উড়িয়ে দেবে।

শঙ্করের জীবনেও এমন একটি ঘটনা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে ঘটে গেল।

সকালবেলা সে একটু নদীর ধারে বেড়িয়ে এসে সবে বাড়ীতে পা দিয়েছে, এমন সময়ে ওপাড়ার রামেশ্বর মুখুজ্জের স্ত্রী এক টুকরো কাগজ নিয়ে এসে তার হাতে দিয়ে বল্লেন— বাবা শঙ্কর, আমার জামায়ের খোঁজ পাওয়া গেছে অনেক দিন পরে। ভদ্রেশ্বরে ওদের বাড়ীতে চিঠি দিয়েছে, কাল পিন্টু সেখান থেকে এসেছে, এই ঠিকানা তারা লিখে দিয়েছে। পড়ো তো বাবা ?

শঙ্কর বললে—উঃ, প্রায় দু-বছরের পর খোঁজ মিল্‌লো! বাড়ী থেকে পালিয়ে গিয়ে কি ভয়টাই দেখালেন ! এর আগেও তো একবার পালিয়ে গেছলেন—না ? তার পর সে কাগজটা খুললে। লেখা আছে—প্রসাদ দাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ইউগান্ডা রেলওয়ে হেডঅফিস, কন্‌স্ট্রাক্‌শন্‌ ডিপার্টমেন্ট, মোম্বাসা, পূর্ব আফ্রিকা।

শঙ্করের হাত থেকে কাগজের টুক্‌রোটা পড়ে গেল। পূর্ব আফ্রিকা! পালিয়ে মানুষে এতদূর যায় ? তবে সে জানে ননীবালা দিদির এই স্বামী অত্যন্ত একরোখা ডানপিটে ও ভবঘুরে ধরনের। একবার এই গ্রামেই তার সঙ্গে শঙ্করের আলাপও হয়েছিল—শঙ্কর তখন এন্ট্রান্স ক্লাসে সবে উঠেছে। লোকটা খুব উদার প্রকৃতির, লেখাপড়া ভালই জানে, তবে কোন একটা চাকরিতে বেশীদিন টিকে থাকতে পারে না, উড়ে বেড়ানো স্বভাব। আর একবার পালিয়ে বর্মা না কোচিন কোথায় যেন গিয়েছিল। এবারও বড়দাদার সঙ্গে কি নিয়ে মনোমালিন্য হওয়ার দরুন বাড়ী থেকে পালিয়েছিল—এ খবর শঙ্কর আগেই শুনেছিল। সেই প্রসাদবাবু পালিয়ে গিয়ে ঠেলে উঠেছে একেবারে পূর্ব আফ্রিকায় !

রামেশ্বর মুখুজ্জের স্ত্রী ভালো বুঝতে পারলেন না তাঁর জামাই কতদূরে গিয়েছে। অতটা দূরত্বের তাঁর ধারণা ছিল না। তিনি চলে গেলে শঙ্কর ঠিকানাটা নিজের নোটবইয়ে লিখে রাখলে এবং সেই সপ্তাহের মধ্যেই

প্রসাদবাবুকে একখানা চিঠি দিলে। শঙ্করকে তাঁর মনে আছে কি ? তাঁর শ্বশুরবাড়ীর গাঁয়ের ছেলে সে। এবার এফ. এ. পাশ দিয়ে বাড়ীতে বসে আছে। তিনি কি একটা চাকরি করে দিতে পারেন তাঁদের রেলের মধ্যে ? যতদূরে হয় সে যাবে।
দেড়মাস পরে, যখন শঙ্কর প্রায় হতাশ হয়ে পড়েছে চিঠির উত্তর-প্রাপ্তি সম্বন্ধে—তখন একখানা খামের চিঠি এল শঙ্করের নামে। তাতে লেখা আছে—

মোম্বাসা
২নং পোর্ট স্ট্রীট

প্রিয় শঙ্কর,

তোমার পত্র পেয়েছি। তোমাকে আমার খুব মনে আছে। কব্জির জোরে তোমার কাছে সেবার হেরে গিয়েছিলুম, সে কথা ভুলিনি। তুমি আসবে এখানে ? চলে এসো। তোমার মত ছেলে যদি বাইরে না বেরুবে, তবে কে আর বেরুবে? এখানে নতুন রেল তৈরী হচ্ছে,

বিভূতি রচনাবলী ১ম শ. ব.২৬

আরও লোক নেবে। যত তাড়াতাড়ি পারো, এসো। তোমার কাজ জুটিয়ে দেবার ভার আমি নিচ্ছি।

তোমাদের— প্রসাদদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

শঙ্করের বাবা চিঠি দেখে খুব খুশি। যৌবনে তিনিও নিজে ছিলেন ডানপিটে ধরনের লোক। ছেলে পাটের কলে চাকরি করতে যাবে তাঁর এতে মত ছিল না, শুধু সংসারের অভাব অনটনের দরুনই শঙ্করের মায়ের মতে সায় দিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

এর মাসখানেক পরে শঙ্করের নামে এক টেলিগ্রাম এল ভদ্রেশ্বর থেকে। সেই জামাইটি দেশে এসেছেন সম্প্রতি। শঙ্কর যেন গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করে টেলিগ্রাম পেয়েই। তিনি আবার মোম্বাসায় ফিরবেন দিন কুড়ির মধ্যে। শঙ্করকে তা হলে সঙ্গে করে তিনি নিয়ে যেতে পারেন।

দুই

চার মাস পরের ঘটনা। মার্চ মাসের শেষ।

মোম্বাসা থেকে রেলপথ গিয়েছে কিসুমু-ভিক্টোরিয়া নায়ানজা হ্রদের ধারে—তারই একটা শাখা লাইন তখন তৈরী হচ্ছিল। জায়গাটা মোম্বাসা থেকে সাড়ে তিনশো মাইল পশ্চিমে। ইউগান্ডা রেলওয়ের নুড্‌সবার্গ স্টেশন থেকে বাহাত্তর মাইল দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে। এখানে শঙ্কর কনস্ট্রাক্‌শন ক্যাম্পের কেরানী ও সহকারী স্টোরকিপার হয়ে এসেছে। থাকে ছোট একটা তাঁবুতে। তার আশে-পাশে অনেক তাঁবু। এখানে এখনও বাড়ীঘর তৈরী হয়নি বলে তাঁবুতেই সবাই থাকে। তাঁবুগুলো একটা খোলা জায়গায় চক্রাকারে সাজানো—তাদের চারিধারে ঘিরে বহু দূরব্যাপী মুক্ত প্রান্তর, দীর্ঘ দীর্ঘ ঘাসে ভরা, মাঝে মাঝে গাছ। তাঁবুগুলোর ঠিক গায়েই খোলা জায়গার শেষ সীমায় একটা বড় বাওবাব্ গাছ। আফ্রিকার বিখ্যাত গাছ, শঙ্কর কতবার ছবিতে দেখেছে, এবার সত্যিকার বাওবাব্ দেখে শঙ্করের যেন আশ মেটে না।

নতুন দেশ, শঙ্করের তরুণ তাজা মন—সে ইউগান্ডার এই নির্জন মাঠ ও বনে নিজের স্বপ্নের সার্থকতাকে যেন খুঁজে পেলে। কাজ শেষ হয়ে যেতেই সে তাঁবু থেকে রোজ বেরিয়ে পড়তো—যেদিকে দু-চোখ যায় সেদিকে বেড়াতে বার হত—পুবে, পশ্চিমে, দক্ষিণে, উত্তরে। সব দিকেই লম্বা লম্বা ঘাস, কোথাও মানুষের মাথা সমান উঁচু, কোথাও তার চেয়েও উঁচু।

প্রিকনস্ট্রাকশন্ তাঁবুর ভারপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার সাহেব একদিন শঙ্করকে ডেকে বললেন-শোনো রায়, ওরকম এখানে বেড়িও না। বিনা বন্দুকে এখানে এক পাও যেও না। প্রথম, এই ঘাসের জমিতে পথ হারাতে পারো। পথ হারিয়ে লোক এসব জায়গায় মারাও গিয়েছে জলের অভাবে। দ্বিতীয়, ইউগান্ডা সিংহের দেশ। এখানে আমাদের সাড়াশব্দ আর হাতুড়ি ঠোকার আওয়াজে সিংহ হয়তো একটু দূরে চলে গিয়েছে—কিন্তু ওদের বিশ্বাস নেই। খুব সাবধান। এসব অঞ্চল মোটেই নিরাপদ নয়।

একদিন দুপুরের পরে কাজকর্ম বেশ পুরোদমে চলছে, হঠাৎ তাঁবু থেকে কিছু দূরে লম্বা ঘাসের জমির মধ্যে মনুষ্যকণ্ঠের আর্তনাদ শোনা গেল। সবাই সেদিকে ছুটে গেল ব্যাপার কি দেখতে। শঙ্করও ছুটল—ঘাসের জমি পাতি-পাতি করে খোঁজা হল—কিছুই নেই সেখানে।

কিসের চীৎকার তবে ?

এঞ্জিনিয়ার সাহেব এলেন। কুলীদের নাম-ডাকা হল, দেখা গেল একজন কুলী অনুপস্থিত। অনুসন্ধানে জানা গেল সে একটু আগে ঘাসের বনের দিকে কি কাজে গিয়েছিল, তাকে ফিরে আসতে কেউ দেখেনি।

খোঁজাখুঁজি করতে করতে ঘাসের বনের বাইরে বালির ওপরে ক'টা সিংহের পায়ের দাগ পাওয়া গেল। সাহেব বন্দুক নিয়ে লোকজনের সঙ্গে পায়ের দাগ দেখে দেখে অনেক দূর গিয়ে একটা বড় পাথরের আড়ালে হতভাগ্য কুলীর রক্তাক্ত দেহ বার করলেন।

তাকে তাঁবুতে ধরাধরি করে নিয়ে আসা হল। কিন্তু সিংহের কোনো চিহ্ন মিলল না। লোকজনের চীৎকারে সে শিকার ফেলে পালিয়েছে। সন্ধ্যার পূর্বেই কুলীটা মারা গেল।

তাঁবুর চারিপাশের লম্বা ঘাস অনেকদূর পর্যন্ত কেটে সাফ্ করে দেওয়া গেল পরদিনই। দিনকতক সিংহের কথা ছাড়া তাঁবুতে আর কোনো গল্পই নেই। তার পর মাসখানেক পরে ঘটনাটা পুরানো হয়ে গেল, সে কথা সকলের মনে চাপা পড়ে গেল। কাজকর্ম আবার বেশ চলল।

সেদিন দিনে খুব গরম। সন্ধ্যার একটু পরেই কিন্তু ঠাণ্ডা পড়ল। কুলীদের তাঁবুর সামনে অনেক কাঠকুটো জ্বালিয়ে আগুন করা হয়েছে। সেখানে তাঁবুর সবাই গোল হয়ে গল্পগুজব করছে। শঙ্করও সেখানে আছে, সে ওদের গল্প শুনছে এবং অগ্নিকুণ্ডের আলোতে 'কেনিয়া মর্নিং নিউজ' পড়ছে। খবরের কাগজখানা পাঁচদিনের পুরানো। কিন্তু এ জনহীন প্রান্তরে তবু এখানেতে বাইরের দুনিয়ায় যা কিছু একটু খবর পাওয়া যায়।

তিরুমল আপ্পা বলে একজন মাদ্রাজী কেরানীর সঙ্গে শঙ্করের খুব বন্ধুত্ব হয়েছিল। তিরুমল তরুণ যুবক, বেশ ইংরেজী জানে, মনেও খুব উৎসাহ। সে বাড়ী থেকে পালিয়ে এসেছে অ্যাড্‌ভেঞ্চারের নেশায়। শঙ্করের পাশে বসে সে আজ সন্ধ্যা থেকে ক্রমাগত দেশের কথা, তার বাপ-মায়ের কথা, তার ছোট বোনের কথা বলছে। ছোট বোনকে সে বড় ভালবাসে। বাড়ী ছেড়ে এসে তার কথাই তিরুমলের বড় মনে হয়। একবার সে দেশের দিকে যাবে

সেপ্টেম্বর মাসের শেষে। মাস-দুই ছুটি মঞ্জুর করবে না সাহেব ?

ক্রমে রাত বেশি হল। মাঝে মাঝে আগুন নিভে যাচ্ছে, আবার কুলীরা তাতে কাঠকুটো ফেলে দিচ্ছে। আরও অনেকে উঠে শুতে গেল। কৃষ্ণপক্ষের ভাঙা চাঁদ ধীরে ধীরে দূরদিগন্তে দেখা দিল—সমগ্র প্রান্তর জুড়ে আলো-আঁধারে লুকোচুরি আর বুনো গাছের দীর্ঘ দীর্ঘ ছায়া।

শঙ্করের ভারি অদ্ভুত মনে হচ্ছিল বহুদূর বিদেশের এই স্তব্ধ রাত্রির সৌন্দর্য। কুলীদের ঘরের একটা খুঁটিতে হেলান দিয়ে একদৃষ্টে সে সমুখের বিশাল জনহীন তৃণভূমির আলো-আঁধার-মাখা রূপের দিকে চেয়ে চেয়ে কত কি ভাবছিল। ওই বাওবাব্ গাছটার ওদিকে অজানা দেশের সীমা কেপটাউন পর্যন্ত বিস্তৃত—মধ্যে পড়বে কত পর্বত অরণ্য, প্রাগৈতিহাসিক যুগের নগর জিম্বারি—বিশাল ও বিভীষিকাময় কালাহারি মরুভূমি, হীরকের দেশ, সোনার খনির দেশ !

একজন বড় স্বর্ণান্বেষী পর্যটক যেতে যেতে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলেন। যে পাথরটাতে লেগে হোঁচট খেলেন—সেটা হাতে তুলে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখলেন, তার সঙ্গে সোনা মেশানো রয়েছে। সে জায়গায় বড় একটা সোনার খনি বেরিয়ে পড়ল। এ ধরনের কত গল্প সে পড়েছে দেশে থাকতে।

এই সেই আফ্রিকা, সেই রহস্যময় মহাদেশ, সোনার দেশ, হীরের দেশ—কত অজানা জাতি, অজানা দৃশ্যাবলী, অজানা জীবজন্তু এর সীমাহীন ট্রপিক্যাল অরণ্যে আত্মগোপন করে আছে, কে তার হিসেব রেখেছে ?

কত কি ভাবতে ভাবতে শঙ্কর কখন ঘুমিয়ে পড়েছে। হঠাৎ কিসের শব্দে তার ঘুম ভাঙল। সে ধড়মড় করে জেগে উঠে বসল। চাঁদ আকাশে অনেকটা উঠেছে। ধবধবে সাদা জ্যোৎস্না দিনের মত পরিষ্কার। অগ্নিকুণ্ডের আগুন গিয়েছে নিবে। কুলীরা সব কুণ্ডলী পাকিয়ে আগুনের ওপরে শুয়ে আছে। কোনোদিকে কোনো শব্দ নেই।

হঠাৎ শঙ্করের দৃষ্টি পড়ল তার পাশে—এখানে তো তিরুমল আপ্পা বসে তার সঙ্গে গল্প করছিল ! সে কোথায়? তা হলে হয়তো সে তাঁবুর মধ্যে ঘুমুতে গিয়ে থাকবে।

শঙ্করও নিজে উঠে শুতে যাবার উদ্যোগ করছে, এমন সময়ে অল্প দূরেই পশ্চিম কোণে মাঠের মধ্যে ভীষণ সিংহগর্জন শুনতে পাওয়া গেল। রাত্রির অস্পষ্ট জ্যোৎস্নালোকে যেন তাঁবু কেঁপে উঠল সে রবে। কুলীরা ধড়মড় করে জেগে উঠল। এঞ্জিনিয়ার সাহেব বন্দুক নিয়ে তাঁবুর বাইরে এলেন। শঙ্কর জীবনে এই প্রথম শুনলে সিংহের গর্জন—সেই দিকদিশাহীন তৃণভূমির মধ্যে শেষরাত্রের জ্যোৎস্নায় সে গর্জন যে কি এক অনির্দেশ্য অনুভূতি তার মনে জাগালে ! —তা ভয় নয়, সে এক রহস্যময় ও জটিল মনোভাব। একজন বৃদ্ধ মাসাই কুলী ছিল তাঁবুতে। সে বললে, সিংহ লোক মেরেছে। লোক না মারলে এমন গর্জন করবে না।

তাঁবুর ভেতর থেকে তিরুমলের সঙ্গী এসে হঠাৎ জানালে তিরুমলের বিছানা শূন্য। সে তাঁবুর মধ্যে কোথাও নেই।

কথাটা শুনে সবাই চমকে উঠল। শঙ্কর নিজে তাঁবুর মধ্যে ঢুকে দেখে এল সত্যিই সেখানে কেউ নেই। তখনি কুলীরা আলো জ্বেলে লাঠি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। সব তাঁবুগুলোতে খোঁজ করা হল, নাম ধরে চীৎকার করে ডাকাডাকি করলে সবাই মিলে—তিরুমলের কোনো সাড়া মিলল না।

তিরুমল যেখানটাতে শুয়ে ছিল, সেখানটাতে ভাল করে দেখা গেল তখন। একটা কোনো ভারী জিনিসকে টেনে নিয়ে যাওয়ার দাগ মাটির ওপর সুস্পষ্ট। ব্যাপারটা বুঝতে কারো দেরি হল না। বাওবাব্ গাছের কাছে তিরুমলের জামার হাতার খানিকটা টুকরো পাওয়া গেল। এঞ্জিনিয়ার সাহেব বন্দুক নিয়ে আগে আগে চললেন, শঙ্কর তাঁর সঙ্গে চলল। কুলীরা তাঁদের অনুসরণ করতে লাগল। সেই গভীর রাত্রে তাঁবু থেকে দূরে মাঠে চারিদিকে অনেক জায়গা খোঁজা হল, তিরুমলের দেহের কোনো সন্ধান মিলল না। এবার আবার সিংহগর্জন শোনা গেল— কিন্তু দূরে। যেন এই নির্জন প্রান্তরের অধিষ্ঠাত্রী কোনো রহস্যময়ী রাক্ষসীর বিকট চীৎকার।

মাসাই কুলীটা বললে—সিংহ দেহ নিয়ে চলে যাচ্ছে। কিন্তু ওকে নিয়ে আমাদের ভুগতে হবে। আরও অনেকগুলো মানুষ ও ঘাল্ না করে ছাড়বে না। সবাই সাবধান। যে সিংহ একবার মানুষ খেতে শুরু করে, সে অত্যন্ত ধূর্ত হয়ে ওঠে।

রাত যখন তিনটে, তখন সবাই ফিরল তাঁবুতে। বেশ ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় সারা মাঠ আলো হয়ে উঠেছে। আফ্রিকার এই অংশে পাখী বড় একটা দেখা যায় না দিনমানে, কিন্তু এক ধরনের রাত্রিচর পাখীর ডাক শুনতে পাওয়া যায় রাত্রে—সে সুর অপার্থিব ধরনের মিষ্ট। এইমাত্র সেই পাখী কোন্ গাছের মাথায় বহুদূরে ডেকে উঠল। মনটা এক মুহূর্তে উদাস করে দেয়। শঙ্কর ঘুমুতে গেল না। আর সবাই তাঁবুর মধ্যে শুতে গেল কারণ পরিশ্রম কারো কম হয়নি। তাঁবুর সামনে কাঠকুটো জ্বালিয়ে প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড করা গেল। শঙ্কর সাহস করে বাইরে বসতে অবিশ্যি পারলে না—এরকম দুঃসাহসের কোনো অর্থ হয় না। তবে সে নিজের খড়ের ঘরে শুয়ে জানালা দিয়ে বিস্তৃত জ্যোৎস্নালোকিত অজানা প্রান্তরের দিকে চেয়ে রইল।

মনে কি এক অদ্ভুত ভাব ! তিরুমলের অদৃষ্ট-লিপি এর জন্যেই বোধহয় তাকে আফ্রিকায় টেনে এনেছিল। তাকেই বা কি জন্যে এখানে এনেছে তার অদৃষ্ট, কে জানে তার খবর ?

আফ্রিকা অদ্ভুত সুন্দর দেখতে—কিন্তু আফ্রিকা ভয়ঙ্কর! দেখতে বাব্‌লা বনে ভর্তি বাংলাদেশের মাঠের মত দেখালে কি হবে, আফ্রিকা অজানা মৃত্যুসঙ্কুল ! যেখানে সেখানে অতর্কিত নিষ্ঠুর মৃত্যুর ফাঁদ পাতা....পরমুহূর্তে কি ঘটবে, এ মুহূর্তে তা কেউ বলতে পারে না।

আফ্রিকা প্রথম বলি গ্রহণ করেছে—তরুণ হিন্দুযুবক তিরুমলকে। সে বলি চায়।

তিরুমল তো গেল, সঙ্গে সঙ্গে ক্যাম্পে পরদিন থেকে এমন অবস্থা হয়ে উঠল যে আর সেখানে সিংহের উপদ্রবে থাকা যায় না। মানুষ-খেকো সিংহ অতি ভয়ানক জানোয়ার । যেমন সে ধূর্ত তেমনি সাহসী। সন্ধ্যা তো দূরের কথা, দিনমানেই একা বেশিদূর যাওয়া যায় না। সন্ধ্যার আগে তাঁবুর মাঠে নানা জায়গায় বড় বড় আগুনের কুণ্ড করা হয়, কুলীরা আগুনের কাছ ঘেঁষে বসে গল্প করে, রান্না করে, সেখানে বসেই খাওয়া-দাওয়া করে। এঞ্জিনিয়ার সাহেব বন্দুক হাতে রাত্রে তিন-চার বার তাঁবুর চারিদিকে ঘুরে পাহারা দেন, ফাঁকা দ্যাওড় করেন—এত সতর্কতার মধ্যেও একটা কুলীকে সিংহে নিয়ে পালালো তিরুমলকে মারবার ঠিক দু'দিন পরে সন্ধ্যারাত্রে। তার পরদিন একটা সোমালি কুলী দুপুরে তাঁবু থেকে তিনশো গজের মধ্যে পাথরের ঢিবিতে পাথর ভাঙতে গেল—সন্ধ্যায় সে আর ফিরে এল না।

সেই রাত্রেই, রাত দশটার পরে, শঙ্কর এঞ্জিনিয়ার সাহেবের তাঁবু থেকে ফিরছে, লোকজন কেউ বড় একটা বাইরে নেই, সকাল সকাল যে যার ঘরে শুয়ে পড়েছে, কেবল এখানে ওখানে দু-একটা নির্বাপিত-প্রায় অগ্নিকুণ্ড। দূরে শেয়াল ডাকছে—শেয়ালের ডাক শুনলেই শঙ্করের মনে হয় সে বাংলাদেশের পাড়াগাঁয়ে আছে—চোখ বুজে সে নিজের গ্রামটা ভাববার চেষ্টা করে, তাদের ঘরের কোণের সেই বিলিতি-আমড়া গাছটা ভাববার চেষ্টা করে—আজও সে একবার থমকে দাঁড়িয়ে তাড়াতাড়ি চোখ বুজলে।

কি চমৎকার লাগে ! কোথায় সে ? সেই তাদের গাঁয়ের বাড়ীতে জানলার কাছে তক্তপোশে শুয়ে ? বিলিতি-আমড়া গাছটার ডালপালা চোখ খুললেই চোখে পড়বে ? ঠিক ? দেখবে সে চোখ খুলে ?

শঙ্কর ধীরে ধীরে চোখ খুললে।

অন্ধকার প্রান্তর। দূরে সেই বড় বাওবাব্ গাছটা অস্পষ্ট অন্ধকারে দৈত্যের মত দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ তার মনে হল সামনের একটা ছাতার মত গোল খড়ের নীচু চালের ওপর একটা কি যেন নড়ছে। পরক্ষণেই সে ভয়ে ও বিস্ময়ে কাঠ হয়ে গেল।

প্রকাণ্ড একটা সিংহ খড়ের চাল থাবা দিয়ে খুঁচিয়ে গর্ত করবার চেষ্টা করছে ও মাঝে মাঝে নাকটা চালের গর্তের কাছে নিয়ে গিয়ে কিসের যেন ঘ্রাণ নিচ্ছে।

তার কাছ থেকে চালাটার দূরত্ব বড় জোর বিশ হাত।

শঙ্কর বুঝলে সে ভয়ানক বিপদগ্রস্ত। সিংহ চালার খড় খুঁচিয়ে গর্ত করতে ব্যস্ত, সেখান দিয়ে ঢুকে সে মানুষ নেবে—শঙ্করকে সে এখনও দেখতে পায়নি। তাঁবুর বাইরে কোথাও লোক নেই, সিংহের ভয়ে বেশী রাত্রে কেউ বাইরে থাকে না। নিজে সে সম্পূর্ণ নিরস্ত্র, একগাছা লাঠি পর্যন্ত নেই হাতে।

শঙ্কর নিঃশব্দে পিছু হঠতে লাগল এঞ্জিনিয়ারের তাঁবুর দিকে সিংহের দিকে চোখ রেখে। এক মিনিট...দু মিনিট....নিজের স্নায়ুমণ্ডলীর ওপর যে তার এত কর্তৃত্ব ছিল; তা এর আগে শঙ্কর জানতো না। একটা ভীতিসূচক শব্দ তার মুখ দিয়ে বেরুল না বা সে হঠাৎ পিছু ফিরে দৌড় দেবার চেষ্টাও করলে না।

এঞ্জিনিয়ারের তাঁবুর পর্দা উঠিয়ে সে ঢুকে দেখল সাহেব টেবিলে বসে তখনও কাজ করছে। সাহেব ওর রকম-সকম দেখে বিস্মিত হয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করবার আগেই ও বললে—সাহেব, সিংহ !...

সাহেব লাফিয়ে উঠল—কৈ ? কোথায় ?

বন্দুকের র‍্যাকে একটা ·৩৭৫ ম্যানলিকার রাইফ্‌ল্ ছিল—সাহেব সেটা নামিয়ে নিলে। শঙ্করকে আর একটা রাইফ্‌ল্ দিলে। দুজনে তাঁবুর পর্দা তুলে আস্তে আস্তে বাইরে এল। একটু দূরেই কুলী লাইনের সেই গোল চালা। কিন্তু চালার ওপর কোথায় সিংহ ? শঙ্কর আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললে—এই মাত্র দেখে গেলাম্ স্যার। ঐ চালার ওপর সিংহ থাবা দিয়ে খড় খোঁচাচ্ছে।

সাহেব বললে—পালিয়েছে। জাগাও সবাইকে।

একটু পরে তাঁবুতে মহা শোরগোল পড়ে গেল। লাঠি, সড়কি, গাঁতি, মুগুর নিয়ে কুলীর দল হল্লা করে বেরিয়ে পড়ল—খোঁজ খোঁজ চারিদিকে, খড়ের চালে সত্যিই ফুটো দেখা গেল। সিংহের পায়ের দাগও পাওয়া গেল। কিন্তু সিংহ উধাও হয়েছে। আগুনের কুণ্ডে বেশী করে কাঠ ও শুক্‌নো খড় ফেলে আগুন আবার জ্বালানো হল। সে রাত্রে অনেকেরই ভাল ঘুম হল না, কিন্তু তাঁবুর বাইরেও বড় একটা কেউ রইল না। শেষ রাত্রের দিকে শঙ্কর নিজের তাঁবুতে শুয়ে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল—একটা মহা শোরগোলের শব্দে তার ঘুম ভেঙে গেল । মাসাই কুলীরা 'সিম্বা' 'সিম্বা' বলে চীৎকার করছে। দু-বার বন্দুকের আওয়াজ হল। শঙ্কর তাঁবুর বাইরে এসে ব্যাপার জিজ্ঞাসা করে জানলে সিংহ এসে আস্তাবলের একটা ভারবাহী অশ্বতরকে জখম করে গিয়েছে—এই মাত্র। সবাই শেষ রাত্রে একটু ঝিমিয়ে পড়েছে আর সেই সময়ে এই কাণ্ড।

পরদিন সন্ধ্যার ঝোঁকে একটা ছোক্‌রা কুলীকে তাঁবুর একশো হাতের মধ্যে থেকে সিংহে নিয়ে গেল। দিন চারেক পরে আর একটা কুলীকে নিলে বাওবাব্‌ গাছটার তলা থেকে।

কুলীরা আর কেউ কাজ করতে চায় না। লম্বা লাইনে গাঁতিওয়ালা কুলীদের অনেক সময়ে খুব ছোট দলে ভাগ হয়ে কাজ করতে হয়— তারা তাঁবু ছেড়ে দিনের বেলাতেও বেশিদূর যেতে চায় না। তাঁবুর মধ্যে থাকাও রাত্রে নিরাপদ নয়। সকলেরই মনে ভয়—প্রত্যেকেই ভাবে এবার তার পালা। কাকে কখন নেবে কিছু স্থিরতা নেই। এই অবস্থায় কাজ হয় না। কেবল মাসাই কুলীরা অবিচলিত রইল—তারা যমকে ভয় করে না। তাঁবু থেকে দু-মাইল দূরে গাঁতির কাজ তারাই করে, সাহেব বন্দুক নিয়ে দিনের মধ্যে চার-পাঁচবার তাদের দেখাশুনো করে আসে।

কত নতুন ব্যবস্থা করা হল, কিছুতেই সিংহের উপদ্রব কমল না। কত চেষ্টা করেও সিংহ শিকার করা গেল না। অনেকে বললে—সিংহ একটা নয়, অনেকগুলো— ক'টা মেরে ফেলা যাবে ? সাহেব বললে—মানুষখেকো সিংহ বেশী থাকে না। এ একটা সিংহেরই কাজ ।

একদিন সাহেব শঙ্করকে ডেকে বললে বন্দুকটা নিয়ে গাঁতিদার কুলীদের একবার দেখে আসতে। শঙ্কর বললে—সাহেব, তোমার ম্যান্‌লিকারটা দাও।।

সাহেব রাজী হল। শঙ্কর বন্দুক নিয়ে একটা অশ্বতরে চড়ে রওনা হল। তাঁবু থেকে মাইলখানেক দূরে এক জায়গায় একটা ছোট জলা। শঙ্কর দূর থেকে জলাটা যখন দেখতে পেয়েছে, তখন বেলা প্রায় তিনটে। কেউ কোনো দিকে নেই, রোদের ঝাঁঝ মাঠের মধ্যে তাপ-তরঙ্গের সৃষ্টি করেছে।

হঠাৎ অশ্বতর থমকে দাঁড়িয়ে গেল। আর কিছুতেই সেটা এগিয়ে যেতে চায় না। শঙ্করের মনে হল জায়গাটার দিকে যেতে অশ্বতরটা ভয় পাচ্ছে। একটু পরে পাশের ঝোপে কি যেন একটা নড়ল। কিন্তু সেদিকে চেয়ে সে কিছু দেখতে পেলে না। সে অশ্বতর থেকে নামল। তবুও অশ্বতর নড়তে চায় না।

হঠাৎ শঙ্করের শরীরে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। ঝোপের মধ্যে সিংহ তার জন্যে ওৎ পেতে বসে নেই তো? অনেক সময়ে এরকম হয় সে জানে, সিংহ পথের পাশে ঝোপঝাপের মধ্যে লুকিয়ে অনেক দূর পর্যন্ত নিঃশব্দে তার শিকারের অনুসরণ করে। নির্জন স্থানে সুবিধা বুঝে তার ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়ে। যদি তাই হয় ? শঙ্কর অশ্বতর নিয়ে আর এগিয়ে যাওয়া উচিত বিবেচনা করলে না। ভাবলে তাঁবুতে ফিরেই যাই। সবে সে তাঁবুর দিকে অশ্বতরের মুখটা ফিরিয়েছে, এমন সময় আবার ঝোপের মধ্যে কি একটা নড়ল। সঙ্গে সঙ্গে ভয়ানক সিংহগর্জন এবং একটা ধূসর বর্ণের বিরাট দেহ সশব্দে অশ্বতরের ওপর এসে পড়ল। শঙ্কর তখন হাত চারেক এগিয়ে আছে। সে তখনি ফিরে দাঁড়িয়ে বন্দুক উঁচিয়ে উপরি উপরি দু-বার গুলি করলে। গুলি লেগেছে কিনা বোঝা গেল না, কিন্তু তখন অশ্বতর মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে—ধূসর বর্ণের জানোয়ারটা পলাতক। শঙ্কর পরীক্ষা করে দেখলে অশ্বতরের কাঁধের কাছে অনেকটা মাংস ছিন্নভিন্ন, রক্তে মাটি ভেসে যাচ্ছে। যন্ত্রণায় সেটা ছট্‌ফট্‌ করছে। শঙ্কর এক গুলিতে তার যন্ত্রণার অবসান করলে।

তারপর সে তাঁবুতে ফিরে এল। সাহেব বললে, সিংহ নিশ্চয়ই জখম হয়েছে। বন্দুকের গুলি যদি গায়ে লাগে তবে দস্তুরমত জখম তাকে হতেই হবে। কিন্তু গুলি লেগেছিল তো ? শঙ্কর বললে—গুলি লাগালাগির কথা সে বলতে পারে না। বন্দুক ছুঁড়েছিল, এই মাত্র কথা। লোকজন নিয়ে খোঁজাখুঁজি করে দু-তিন দিনেও কোন আহত বা মৃত সিংহের সন্ধান কোথাও পাওয়া গেল না।

জুন মাসের প্রথম থেকে বর্ষা নামল। কতকটা সিংহের উপদ্রবের জন্যে, কতকটা বা জলাভূমির সান্নিধ্যের জন্যে অস্বাস্থ্যকর হওয়ায় তাঁবু ওখান থেকে উঠে গেল।

শঙ্করকে আর কন্‌স্ট্রাকশন তাঁবুতে থাকতে হল না। কিসুমু থেকে প্রায় ত্রিশ মাইল দূরে। একটা ছোট স্টেশনে সে স্টেশন মাস্টারের কাজ পেয়ে জিনিসপত্র নিয়ে সেখানেই চলে গেল।

তিন

নতুন পদ পেয়ে উৎফুল্ল মনে শঙ্কর যখন স্টেশনটাতে এসে নামল, তখন বেলা তিনটে হবে। স্টেশন ঘরটা খুব ছোট। মাটির প্ল্যাটফর্ম, প্ল্যাটফর্ম আর স্টেশন ঘরের আশপাশ কাঁটা তারের বেড়া দিয়ে ঘেরা। স্টেশন ঘরের পিছনে তার থাকবার কোয়ার্টার। পায়রার খোপের মত ছোট। যে ট্রেনখানা তাকে বহন করে এনেছিল, সেখানা কিসুমুর দিকে চলে গেল। শঙ্কর যেন অকূল সমুদ্রে পড়ল। এত নির্জন স্থান সে জীবনে কখনো কল্পনা করেনি।

এই স্টেশনে সে একমাত্র কর্মচারী। একটা কুলী পর্যন্ত নেই। সে-ই কুলী, সে-ই পয়েন্টস্‌ম্যান, সে-ই সব।

এরকম ব্যবস্থার কারণ হচ্ছে যে এসব স্টেশন এখনও মোটেই আয়কর নয়। এর অস্তিত্ব এখনও পরীক্ষা-সাপেক্ষ। এদের পেছনে রেল-কোম্পানী বেশী খরচ করতে রাজী নয়। একখানি ট্রেন সকালে, একখানি এই গেল—আর সারা দিন-রাত ট্রেন নেই।

সুতরাং তার হাতে প্রচুর অবসর আছে। চার্জ বুঝে নিতে হবে এই যা একটু কাজ। আগের স্টেশন মাস্টারটি গুজরাটি, বেশ ইংরেজী জানে। সে নিজের হাতে চা করে নিয়ে এল। চার্জ বোঝাবার বেশী কিছু নেই। গুজরাটি স্টেশন মাস্টার তাকে পেয়ে খুব খুশি। ভাবে বোধ হল সে কথা বলবার সঙ্গী পায়নি অনেকদিন। দুজনে প্ল্যাটফর্মের এদিক ওদিক পায়চারি করলে।

শঙ্কর বললে—কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা কেন ?

গুজরাটি ভদ্রলোকটি বললে—ও কিছু নয়। নির্জন জায়গা—তাই।

শঙ্করের মনে হল কি একটা কথা লোকটা গোপন করে গেল। শঙ্করও আর পীড়াপীড়ি করলে না। রাত্রে ভদ্রলোক রুটি গড়ে শঙ্করকে খাবার নিমন্ত্রণ করলে। খেতে বসে হঠাৎ লোকটি চেঁচিয়ে উঠল—ঐ যাঃ, ভুলে গিয়েছি।

—কি হল ?

—খাবার জল নেই মোটে, ট্রেন থেকে নিতে একদম ভুলে গিয়েছি।

—সে কি ? এখানে খাবার জল কোথাও পাওয়া যায় না ?

—কোথাও না। একটা কুয়ো অছে, তার জল বেজায় তেতো আর কষা। সে জলে বাসন মাজা ছাড়া কোনো কাজ হয় না। খাবার জল ট্রেন থেকে দিয়ে যায়।

বেশ জায়গা বটে। খাবার জল নেই, মানুষ-জন নেই। এখানে স্টেশন করেছে কেন তা শঙ্কর বুঝতে পারলে না।

পরদিন সকালে ভূতপূর্ব স্টেশন মাস্টার চলে গেল। শঙ্কর পড়ল একা। নিজের কাজ করে, রাঁধে খায়, ট্রেনের সময় প্ল্যাটফর্মে গিয়ে দাঁড়ায়। দুপুরে বই পড়ে কি বড় টেবিলটাতে শুয়ে ঘুমোয়। বিকেলের দিকে ছায়া পড়লে প্ল্যাটফর্মে পায়চারি করে।

স্টেশনের চারিধার ঘিরে ধূধূ সীমাহীন প্রান্তর, দীর্ঘ ঘাসের বন, মাঝে ইউকা, বাবলা গাছ—দূরে পাহাড়ের সারি সারা চক্রবাল জুড়ে। ভারী সুন্দর দৃশ্য।

গুজরাটি লোকটি ওকে বারণ করে গিয়েছিল—একা যেন এই সব মাঠে সে না বেড়াতে বার হয়।

শঙ্কর বলেছিল কেন ?

সে প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর গুজরাটি ভদ্রলোকটির কাছ থেকে পাওয়া যায়নি। কিন্তু তার উত্তর অন্য দিক থেকে সে রাত্রেই মিলল।

সকাল-রাতেই আহারাদি সেরে শঙ্কর স্টেশন ঘরে বাতি জ্বালিয়ে বসে ডায়েরী লিখছে—স্টেশন ঘরেই সে শোবে—সামনের কাচ-বসানো দরজাটি বন্ধ আছে কিন্তু আগল দেওয়া নেই—কিসের শব্দ শুনে সে দরজার দিকে চেয়ে দেখে দরজার ঠিক বাইরে কাচে নাক লাগিয়ে প্রকাণ্ড সিংহ ! শঙ্কর কাঠের মত বসে রইল। দরজা একটু জোর করে ঠেললেই খুলে যাবে। সেও সম্পূর্ণ নিরস্ত্র। টেবিলের ওপর কেবল কাঠের রুলটা মাত্র আছে।

সিংহটা কিন্তু কৌতূহলের সঙ্গে শঙ্কর ও টেবিলের কেরোসিন বাতিটার দিকে চেয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। খুব বেশীক্ষণ ছিল না, হয়তো মিনিট দুই—কিন্তু শঙ্করের মনে হল সে আর সিংহটা কতকাল ধরে পরস্পরের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার পর সিংহ ধীরে ধীরে অনাসক্ত ভাবে দরজা থেকে সরে গেল। শঙ্কর হঠাৎ চেতনা ফিরে পেল। সে তাড়াতাড়ি গিয়ে দরজার আগলটা তুলে দিলে।

এতক্ষণে সে বুঝতে পারলে স্টেশনের চারিদিকে কাঁটা তারের বেড়া কেন আছে। কিন্তু শঙ্কর একটু ভুল করেছিল—সে আংশিক ভাবে বুঝেছিল মাত্র, বাকী উত্তরটা পেতে দু-একদিন বিলম্ব ছিল।

সেটা এল অন্য দিক থেকে।

পরদিন সকালের ট্রেনের গার্ডকে সে রাত্রের ঘটনাটা বললে। গার্ড লোকটি ভাল, সব শুনে বললে—এসব অঞ্চলে সর্বত্রই এমন অবস্থা। এখান থেকে বারো মাইল দূরে আর একটা তোমার মত ছোট স্টেশন আছে—সেখানেও এই দশা। এখানে তো যে কাণ্ড—

সে কি একটা কথা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ কথা বন্ধ করে ট্রেনে উঠে পড়ল। যাবার সময় চলন্ত ট্রেন থেকে বলে গেল, বেশ সাবধানে থেকো সর্বদা-

শঙ্কর চিন্তিত হয়ে পড়ল—এরা কি কথাটা চাপা দিতে চায় ? সিংহ ছাড়া আরও কিছু আছে নাকি ? যা হোক, সেদিন থেকে শঙ্কর প্ল্যাটফর্মে স্টেশনে ঘরের সামনে রোজ আগুন জ্বালিয়ে রাখে। সন্ধ্যার আগেই দরজা বন্ধ করে স্টেশন ঘরে ঢোকে—অনেক রাত পর্যন্ত বসে পড়াশুনো করে বা ডায়েরী লেখে। রাত্রের অভিজ্ঞতা অদ্ভুত। বিস্তৃত প্রান্তরে ঘন অন্ধকার নামে, প্ল্যাটফর্মের ইউকা গাছটার ডালপালার মধ্যে দিয়ে রাত্রির বাতাস বেধে কেমন একটা শব্দ হয়, মাঠের মধ্যে প্রহরে প্রহরে শেয়াল ডাকে, এক একদিন গভীর রাতে দূরে কোথায় সিংহের গর্জন শুনতে পাওয়া যায়—অদ্ভুত জীবন।

ঠিক এই জীবনই সে চেয়েছিল। এ তার রক্তে আছে। এই জনহীন প্রান্তর, এই রহস্যময়ী রাত্রি, অচেনা নক্ষত্রে ভরা আকাশ, এই বিপদের আশঙ্কা—এই তো জীবন ! শান্ত নিরাপদ জীবন নিরীহ কেরানীর জীবন হতে পারে—তার নয়-

সেদিন বিকেলের ট্রেন রওনা করে দিয়ে সে নিজের কোয়ার্টারের রান্নাঘরে ঢুকতে যাচ্ছে এমন সময়ে খুঁটির গায়ে কি একটা দেখে সে তিন হাত লাফ দিয়ে পিছিয়ে এল—প্রকাণ্ড একটা হলদে খড়িশ গোখরো তাকে দেখে ফণা উদ্যত করে খুঁটি থেকে প্রায় একহাত বাইরে মুখ বাড়িয়েছে। আর দু সেকেণ্ড পরে যদি শঙ্করের চোখ সেদিকে পড়ত—তা হলে—না, এখন সাপটাকে মারবার কি করা যায় ? কিন্তু সাপটা পরমুহূর্তে খুঁটিবেয়ে উপরে খড়ের চালের মধ্যে লুকিয়ে পড়ল। বেশ কাণ্ড বটে। ঐ ঘরে গিয়ে শঙ্করকে এখন ভাত রাঁধতে বসতে হবে। এ সিংহ নয় যে দরজা বন্ধ করে আগুন জ্বেলে রাখবে। খানিকটা ইতস্ততঃ করে শঙ্কর অগত্যা রান্নাঘরে ঢুকল এবং কোনরকমে তাড়াতাড়ি রান্না সেরে সন্ধ্যা হবার আগেই খাওয়া-দাওয়া সাঙ্গ করে সেখান থেকে বেরিয়ে স্টেশন ঘরে এল। কিন্তু স্টেশন ঘরেই বা বিশ্বাস কি ? সাপ কখন কোন ফাঁক দিয়ে ঘরে ঢুকবে, তাকে কি আর ঠেকিয়ে রাখা যাবে ?

পরদিনের সকালের ট্রেনে গার্ডের গাড়ী থেকে একটা নতুন কুলী তার রসদের বস্তা নামিয়ে দিতে এল। সপ্তাহে দু'দিন মোম্বাসা থেকে চাল আর আলু রেলকোম্পানী এই সব নির্জন স্টেশনের কর্মচারীদের পাঠিয়ে দেয়—মাসিক বেতন থেকে এর দাম কেটে নেওয়া হয়।

যে কুলীটা রসদের বস্তা নামিয়ে দিতে এল সে ইন্ডিয়ান, গুজরাট অঞ্চলে বাড়ী। সে বস্তাটা নামিয়ে কেমন যেন অদ্ভুত ভাবে চাইলে শঙ্করের দিকে, এবং পাছে শঙ্কর তাকে কিছু জিজ্ঞেস করে, এই ভয়েই যেন তাড়াতাড়ি গাড়ীতে গিয়ে উঠে পড়ল।

কুলীর সে দৃষ্টি শঙ্করের চোখ এড়ায়নি। কি রহস্য জড়িত আছে যেন এই জায়গাটার সঙ্গে, কেউ তা ওর কাছে প্রকাশ করতে চায় না—প্রকাশ করা যেন বারণ আছে। ব্যাপার কি?

দিন দুই পরে ট্রেন পাশ করে সে নিজের কোয়ার্টারে ঢুকতে যাচ্ছে—আর একটু হলে সাপের ঘাড়ে পা দিয়েছিল আর কি! সেই খড়িশ গোখরো সাপ ! পূর্বদৃষ্ট সাপটাও হতে পারে, নতুন একটা যে নয় তারও কোনো প্রমাণ নেই।।

শঙ্কর সেই দিন স্টেশন ঘর, নিজের কোয়ার্টার ও চারধারের জমি ভাল করে পরীক্ষা করে দেখলে। সারা জায়গা মাটিতে বড় বড় গর্ত, কোয়ার্টারের উঠানে, রান্নাঘরের দেওয়ালে, কাঁচা প্ল্যাটফর্মের মাঝে মাঝে সর্বত্র গর্ত ও ফাটল আর ইঁদুরের মাটি। তবুও সে কিছু বুঝতে পারলে না।।

একদিন সে স্টেশন ঘরে ঘুমিয়ে আছে, রাত অনেক। ঘর অন্ধকার—হঠাৎ শঙ্করের ঘুম ভেঙে গেল। পাঁচটা ইন্দ্রিয়ের বাইরে আর একটা কোন্ ইন্দ্রিয় যেন মুহূর্তের জন্যে জাগরিত হয়ে উঠে তাকে জানিয়ে দিলে যে সে ভয়ানক বিপদে পড়বে। ঘোর অন্ধকার, শঙ্করের সমস্ত শরীর যেন শিউরে উঠল। টর্চটা হাতড়ে পাওয়া যায় না কেন? অন্ধকারের মধ্যে যেন একটা কিসের অস্পষ্ট শব্দ হচ্ছে ঘরের মধ্যে। হঠাৎ টর্চটা তার হাতে ঠেকল, এবং কলের পুতুলের মত সে সামনের দিকে ঘুরিয়ে টর্চটা জ্বাললে।

সঙ্গে সঙ্গে সে ভয়ে ও বিস্ময়ে কাঠ হয়ে টর্চটা ধরে বিছানার ওপরই বসে রইল।

দেওয়াল ও তার বিছানার মাঝামাঝি জায়গায় মাথা উঁচু করে তুলে ও টর্চের আলো পড়ার দরুন সাময়িক ভাবে আলো-আঁধার লেগে থ' খেয়ে আছে আফ্রিকার ক্রূর ও হিংস্রতম সর্প—কালো মাম্বা! ঘরের মেজে থেকে সাপটা প্রায় আড়াই হাত উঁচু হয়ে উঠেছে—সেটা এমন কিছু আশ্চর্য নয় যখন ব্ল্যাক মাম্বা সাধারণত মানুষকে তাড়া করে তার ঘাড়ে ছোবল মারে। ব্ল্যাক মাম্বার হাত থেকে রেহাই পাওয়া এক প্রকার পুনর্জন্ম তাও শঙ্কর শুনেছে।

শঙ্করের একটা গুণ বাল্যকাল থেকেই আছে, বিপদে তার সহজে বুদ্ধিভ্রংশ হয় না—আর তার স্নায়ুমণ্ডলীর 'উপর সে ঘোর বিপদেও কর্তৃত্ব বজায় রাখতে পারে।

শঙ্কর বুঝলে হাত যদি তার একটু কেঁপে যায়—তবে যে মুহূর্তে সাপটার চোখ থেকে আলো সরে যাবে—সেই মুহূর্তে ওর আলো-আঁধারি কেটে যাবে এবং তখুনি সে করবে আক্রমণ।

সে বুঝলে তার আয়ু নির্ভর করছে এখন দৃঢ় ও অবিকম্পিত হাতে টর্চটা সাপের চোখের দিকে ধরে থাকার ওপর। যতক্ষণ সে এরকম ধরে থাকতে পারবে ততক্ষণ সে নিরাপদ। কিন্তু যদি টর্চটা একটুও এদিক ওদিক সরে যায়?

শঙ্কর টর্চ ধরেই রইল। সাপের চোখ দুটো জ্বলছে যেন দুটো আলোর দানার মত। কি ভীষণ শক্তি ও রাগ প্রকাশ পাচ্ছে চাবুকের মত খাড়া উদ্যত তার কালো মিশমিশে সরু দেহটাতে !....

শঙ্কর ভুলে গেল চারিপাশের সব আসবাব-পত্র, আফ্রিকা দেশটা, তার রেলের চাকরি, মোম্বাসা থেকে কিসুমু লাইনটা, তার দেশ, তার বাবা মা—সমস্ত জগৎটা শূন্য হয়ে গিয়ে সামনের ওই দুটো জ্বলজ্বলে আলোর দানায় পরিণত হয়েছে....তার বাইরে সব শূন্য। অন্ধকার। মৃত্যুর মত শূন্য, প্রলয়ের পরের বিশ্বের মত অন্ধকার। সত্য কেবল ওই মহাহিংস্র উদ্যত-ফণা সর্প, যেটা প্রত্যেক ছোবলে ১৫০০ মিলিগ্রাম তীব্র বিষ ক্ষতস্থানে ঢুকিয়ে দিতে পারে এবং দেবার জন্যে ওৎ পেতে রয়েছে।....

শঙ্করের হাত ঝিম্‌ঝিম্‌ করছে, আঙ্গুল অবশ হয়ে আসছে, কনুই থেকে বগল পর্যন্ত হাতের যেন সাড়া নেই। কতক্ষণ টর্চ ধরে থাকবে ? আলোর দানা দুটো হয়তো সাপের চোখ নয়....জোনাকি পোকা কিংবা নক্ষত্র....কিংবা....

টর্চের ব্যাটারির তেজ কমে আসছে না ? সাদা আলো যেন হলদে ও নিস্তেজ হয়ে আসছে। ?....কিন্তু জোনাকী পোকা কিংবা নক্ষত্র দুটো তেমনি জ্বলছে। রাত না দিন ? ভোর হবে না সন্ধ্যা হবে ?

শঙ্কর নিজেকে সামলে নিলে। ওই চোখ দুটোর জ্বালাময়ী দৃষ্টি তাকে যেন মোহগ্রস্ত করে তুলেছে। সে সজাগ থাকবে। এ তেপান্তরের মাঠে চেঁচালেও কেউ কোথাও নেই সে জানে—তার নিজের স্নায়ুমণ্ডলীর দৃঢ়তার ওপর নির্ভর করছে তার জীবন। কিন্তু সে পারছে না যে, হাত যেন টন্‌টন্‌ করে অবশ হয়ে আসছে, আর কতক্ষণ সে টর্চ ধরে থাকবে ? সাপে না হয় ছোবল দিক্‌ কিন্তু হাতখানা একটু নামিয়ে নিলে সে আরাম বোধ করবে এখন।

তার পরেই ঘড়িতে টংটং করে তিনটে বাজলো। ঠিক রাত তিনটে পর্যন্তই বোধ হয় শঙ্করের আয়ু ছিল, কারণ তিনটে বাজবার সঙ্গে সঙ্গে তার হাত কেঁপে উঠে নড়ে গেল—সামনের আলোর দানা গেল নিভে। কিন্তু সাপ কৈ? তাড়া করে এল না কেন ?

পরক্ষণেই শঙ্কর বুঝতে পারলে সাপটাও সাময়িক মোহগ্রস্ত হয়েছে তার মত। এই অবসর....বিদ্যুতের চেয়েও বেগে সে টেবিল থেকে এক লাফ মেরে অন্ধকারের মধ্যে দরজার আগল খুলে ফেলে ঘরের বাইরে গিয়ে দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ করে দিলে।....

সকালের ট্রেন এল। শঙ্কর বাকী রাতটা প্ল্যাট্‌ফর্মেই কাটিয়েছে। ট্রেনের গার্ডকে বললে সব ব্যাপার। গার্ড বললো—চলো দেখি স্টেশন ঘরের মধ্যে। ঘরের মধ্যে কোথাও সাপের চিহ্নও পাওয়া গেল না। গার্ড লোকটা ভালো বললে, বলি তবে শোনো। খুব বেঁচে গিয়েছ কাল রাত্রে। এতদিন কথাটা তোমায় বলিনি, পাছে ভয় পাও। তোমার আগে যিনি স্টেশন মাস্টার এখানে ছিলেন—তিনিও সাপের উপদ্রবেই এখান থেকে পালান। তাঁর আগে দুজন স্টেশন মাস্টার এই স্টেশনের কোয়ার্টারে সাপের কামড়ে মরেছে। আফ্রিকার ব্ল্যাক্‌ মাম্বা যেখানে থাকে, তার ত্রিসীমানায় লোক আসে না। বন্ধুভাবে কথাটা বললাম, ওপরওয়ালাদের বোল না যেন যে, আমার কাছ থেকে এ কথা শুনেছ। ট্রান্সফারের দরখাস্ত করো।

শঙ্কর বললে—দরখাস্তের উত্তর আসতেও তো দেরি হবে, তুমি একটা উপকার করো। আমি এখানে একেবারে নিরস্ত্র, আমাকে একটা বন্দুক কি রিভলভার যাবার পথে দিয়ে যাও। আর কিছু কার্বলিক অ্যাসিড। ফিরবার পথেই কার্বলিক অ্যাসিডটা আমায় দিয়ে যেও।

ট্রেন থেকে সে একটা কুলীকে নামিয়ে নিলে এবং দুজনে মিলে সারাদিন সর্বত্র গর্ত বুজিয়ে বেড়ালে। পরীক্ষা করে দেখে মনে হল কাল রাত্রে স্টেশন ঘরের পশ্চিমের দেওয়ালের কোণে একটা গর্ত থেকে সাপটা বেরিয়েছিল। গর্তগুলো ইঁদুরের, বাইরের সাপ দিনমানে ইঁদুর খাবার লোভে গর্তে ঢুকেছিল হয়তো। গর্তটা বেশ ভাল করে বুজিয়ে দিলে। ডাউন ট্রেনের গার্ডের কাছ থেকে এক বোতল কার্বলিক অ্যাসিড পাওয়া গেল—ঘরের সর্বত্র ও আশেপাশে সে অ্যাসিড ছড়িয়ে দিলে। কুলীটা তাকে একটা বড় লাঠি দিয়ে গেল। দু-তিন দিনের মধ্যে রেল কোম্পানী থেকে ওকে একটা বন্দুক দিলে ।

চার

স্টেশনে জলের বড় কষ্ট। ট্রেন থেকে জল দেয়, তাতে রান্না-খাওয়া কোনো রকমে চলে—স্নান আর হয় না। এখানকার কুয়োর জলও শুকিয়ে গিয়েছে। একদিন সে শুনলে স্টেশন থেকে মাইল তিনেক দূরে একটা জলাশয় আছে, সেখানে ভাল জল পাওয়া যায়, মাছও আছে।

স্নান ও মাছ ধরার আকর্ষণে একদিন সে সকালের ট্রেন রওনা করে দিয়ে সেখানে মাছ ধরতে চলল—সঙ্গে একজন সোমালি কুলী, সে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল। মাছ ধরবার সাজ-সরঞ্জাম মোম্বাসা থেকে আনিয়ে নিয়েছিল। জলাশয়টা মাঝারি গোছের, চারিধারে উঁচু ঘাসের বন, ইউকা গাছ, নিকটেই একটা অনুচ্চ পাহাড়। জলে সে স্নান সেরে উঠে ঘণ্টা-দুই ছিপ ফেলে ট্যাংরা জাতীয় ছোট ছোট মাছ অনেকগুলি পেলে। মাছ অদৃষ্টে জোটেনি অনেক দিন কিন্তু আর বেশী দেরি করা চলবে না—কারণ আবার বিকেল চারটের মধ্যে স্টেশনে পৌঁছুনো চাই—বিকেলের ট্রেন পাস করাবার জন্যে।

প্রায়ই সে মাঝে মাঝে মাছ ধরতে যায়, কোনো দিন সঙ্গে লোক থাকে—প্রায়ই একা যায়। স্নানের কষ্টও ঘুচেছে।।

গ্রীষ্মকাল ক্রমেই প্রখর হয়ে উঠল। আফ্রিকার দারুণ গ্রীষ্ম—বেলা ন'টার পর থেকে আর রৌদ্রে যাওয়া যায় না। এগারোটার পর থেকে শঙ্করের মনে হয় যেন দিগবিদিক্ দাউ দাউ করে জ্বলছে। তবুও সে ট্রেনের লোকের মুখে শুনলে মধ্য আফ্রিকা ও দক্ষিণ আফ্রিকার গরমের কাছে এ নাকি কিছুই নয়।

শীঘ্রই এমন একটা ঘটনা ঘটল যা থেকে শঙ্করের জীবনের গতি মোড় ঘুরে অন্য পথে চলে গেল। একদিন সকালের দিকে শঙ্কর মাছ ধরতে গিয়েছিল। যখন ফিরছে তখন বেলা তিনটে। স্টেশন যখন আর মাইলটাক্ আছে, তখন শঙ্করের কানে গেল সেই রৌদ্রদগ্ধ প্রান্তরের মধ্যে কে যেন কোথায় অস্ফুট আর্তস্বরে কি বলছে। কোন্ দিক থেকে স্বরটা আসছে, লক্ষ্য করে কিছুদূর যেতেই দেখলে একটা ইউকা গাছের নীচে স্বল্পমাত্র ছায়াটুকুতে কে একজন বসে আছে।

শঙ্কর দ্রুতপদে তার নিকটে গেল। লোকটা ইউরোপীয়ান—পরনে তালি-দেওয়া ছিন্ন ও মলিন কোর্টপ্যান্ট। একমুখ লাল দাড়ি, বড় বড় চোখ, মুখের গড়ন বেশ সুশ্রী, দেহও বেশ বলিষ্ঠ ছিল বোঝা যায়, কিন্তু সম্ভবত রোগে, কষ্টে ও অনাহারে বর্তমানে শীর্ণ। লোকটা গাছের গুঁড়ি হেলান দিয়ে অবসন্ন ভাবে পড়ে আছে। তার মাথার মলিন সোলার টুপিটা এক দিকে গড়িয়ে পড়েছে মাথা থেকে—পাশে একটা খাকি কাপড়ের বড় ঝোলা।

শঙ্কর ইংরিজিতে জিজ্ঞেস করলে—তুমি কোথা থেকে আসছো ?

লোকটা কথার উত্তর না দিয়ে মুখের কাছে হাত নিয়ে গিয়ে জলপানের ভঙ্গি করে বললে—একটু জল ! জল !

শঙ্কর বললে—এখানে তো জল নেই ! আমার ওপর ভর দিয়ে স্টেশন পর্যন্ত আসতে পারবে ?

অতি কষ্টে খানিকটা ভর দিয়ে এবং শেষের দিকে এক রকম শঙ্করের কাঁধে চেপে লোকটা প্ল্যাটফর্মে পৌঁছুলো। ওকে আনতে গিয়ে দেরী হয়ে গেল ; বিকেলের ট্রেন ওর অনুপস্থিতিতেই চলে গিয়েছে। ও লোকটাকে স্টেশন ঘরে বিছানা পেতে শোয়ালে, জল খাইয়ে সুস্থ করলে, কিছু খাদ্যও এনে দিলে। সে খানিকটা চাঙ্গা হয়ে উঠল বটে, কিন্তু শঙ্কর দেখলে লোকটার ভারী জ্বর হয়েছে। অনেক দিনের অনিয়মে, পরিশ্রমে, অনাহারে তার শরীর একেবারে ভেঙে গিয়েছে—দু-চার দিনে সে সুস্থ হবে না।

লোকটা একটু পরে পরিচয় দিলে। তার নাম ডিয়েগো আলভারেজ্—জাতে পর্তুগিজ, তবে আফ্রিকার সূর্য তার বর্ণ তামাটে করে দিয়েছে।

রাত্রে ওকে স্টেশনে রাখলে শঙ্কর। কিন্তু ওর অসুখ দেখে সে পড়ে গেল বিপদে—এখানে ওষুধ নেই, ডাক্তার নেই—সকালের ট্রেন মোম্বাসার দিকে যায় না, বিকেলের ট্রেনে গার্ড রোগীকে তুলে নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু রাত কাটতে এখনো অনেক দেরী। বিকেলের গাড়ীখানা স্টেশনে এসে যদি পাওয়া যেত, তবে তো কোনো কথাই ছিল না।

শঙ্কর রোগীর পাশে রাত জেগে বসে রইল। লোকটির শরীরে কিছু নেই। খুব সম্ভব কষ্ট ও অনাহার ওর অসুখের কারণ। এই দূর বিদেশে ওর কেউ নেই—শঙ্কর না দেখলে ওকে দেখবে কে ?....বাল্যকাল থেকেই পরের দুঃখ সহ্য করতে পারে না সে—শঙ্কর যে ভাবে সারা রাত তার সেবা করলে, তার কোনো আপনার লোক ওর চেয়ে বেশী কিছু করতে পারতো না।

উত্তর-পূর্ব কোণের অনুচ্চ পাহাড়শ্রেণীর পেছন থেকে চাঁদ উঠছে যখন সে রাত্রে—ঝম্‌ঝম্ করছে নিস্তব্ধ নিশীথ রাত্রি—তখন হঠাৎ প্রান্তরের মধ্যে ভীষণ সিংহ-গর্জন শোনা গেল । রোগী তন্দ্রাচ্ছন্ন ছিল—সিংহের ডাকে সে ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসল। শঙ্কর বললে—ভয় নেই—শুয়ে থাকো। বাইরে সিংহ ডাকছে। দরজা বন্ধ আছে।

তার পর শঙ্কর আস্তে আস্তে দরজা খুলে প্ল্যাটফর্মে এসে দাঁড়ালো। দাঁড়িয়ে চারিধারে দেখবামাত্রই যেন সে রাত্রির অপূর্ব দৃশ্য তাকে মুগ্ধ করে ফেললে। চাঁদ উঠছে দূরের আকাশপ্রান্তে—ইউকা গাছের লম্বা লম্বা ছায়া পড়েছে পুর্ব থেকে পশ্চিমে, ঘাসের বন যেন রহস্যময় নিস্পন্দ। সিংহ ডাকছে স্টেশনে কোয়ার্টারের পেছনে প্রায় পাঁচশো গজের মধ্যে। কিন্তু সিংহের ডাক আজকাল গা-সওয়া হয়ে উঠেছে—ওতে আর আগের মত ভয় পায় না।

রাত্রির সৌন্দর্য এত আকৃষ্ট করেছে ওকে যে ও সিংহের সান্নিধ্য যেন ভুলে গেল।

ফিরে ও স্টেশন ঘরে ঢুকল। টং টং করে ঘড়িতে দুটো বেজে গেল। ঘরে ঢুকে দেখলে

রোগী বিছানায় উঠে বসে আছে। বললে—একটু জল দাও, খাবো।

লোকটা বেশ ভাল ইংরিজি বলতে পারে। শঙ্কর টিন থেকে জল নিয়ে ওকে খাওয়ালে।

লোকটার জ্বর তখন যেন কমেছে। সে বললে—তুমি কি বলছিলে? আমার ভয় করছে ভাবছিলে ? ডিয়েগো আল্‌ভারেজ ভয় করবে ? ইয়াং ম্যান, তুমি ডিয়েগো আল্‌ভারেজকে জানো না। লোকটার ওষ্ঠপ্রান্তে একটা হতাশা, বিষাদ ও ব্যঙ্গ মেশানো অদ্ভুত ধরনের হাসি দেখা দিলে। সে অবসন্নভাবে বালিশের গায়ে ঢলে পড়ল। ওই হাসিতে শঙ্করের মনে হল এ লোক সাধারণ লোক নয়। তখন ওর হাতের দিকে নজর পড়ল শঙ্করের। বেঁটে বেঁটে মোটা মোটা আঙ্গুল—দড়ির মত শিরাবহুল হাত, তাম্রাভ দাড়ির নীচে চিবুকের ভাব শক্ত মানুষের পরিচয় দিচ্ছে। এতক্ষণ পরে খানিকটা জর কমে যাওয়াতে আসল মানুষটা বেরিয়ে আসছে যেন ধীরে ধীরে।।

লোকটা বললে—সরে এসো কাছে। তুমি আমার যথেষ্ট উপকার করেছ। আমার নিজের ছেলে থাকলে এর বেশী করতে পারতো না। তবে একটা কথা বলি—আমি বাঁচবো না। আমার মন বলছে আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে। তোমার উপকার করে যেতে চাই। তুমি ইন্ডিয়ান? এখানে কত মাইনে পাও ? এই সামান্য মাইনের জন্যে দেশ ছেড়ে এত দূর এসে আছ যখন, তখন তোমার সাহস আছে, কষ্ট সহ্য করবার শক্তি আছে। আমার কথা মন দিয়ে শোনো, কিন্তু প্রতিজ্ঞা করো আজ তোমাকে যে-সব কথা বলবো—আমার মৃত্যুর পূর্বে তা তুমি কারো কাছে প্রকাশ করবে না ?

শঙ্কর সেই আশ্বাসই দিলে। তারপর সেই অদ্ভুত রাত্রি ক্রমশ কেটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লোকটা এমন এক আশ্চর্য, অবিশ্বাস্য ধরনের আশ্চর্য কাহিনী শুনিয়ে গেল—যা সাধারণতঃ উপন্যাসেই পড়া যায়।

ডিয়েগো আল্‌ভারেজের কথা

ইয়্যাং ম্যান্, তোমার বয়েস কত হবে, বাইশ ?....তুমি যখন মায়ের কোলে শিশু—আজ বিশ বছর আগের কথা, ১৮৮৮/৮৯ সালের দিকে আমি কেপ কলোনির উত্তরে পাহাড় জঙ্গলের মধ্যে সোনার খনি সন্ধান করে বেড়াচ্ছিলাম। তখন বয়েস ছিল কম, দুনিয়ার কোনো বিপদই বিপদ বলে গ্রাহ্য করতাম না।

বুলাওয়েও শহর থেকে জিনিসপত্র কিনে একাই রওনা হলাম, সঙ্গে কেবল দুটি গাধা, জিনিসপত্র বইবার জন্যে ! জাম্বেজী নদী পার হয়ে চলেছি, পথ ও দেশ সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, শুধু ছোটখাটো পাহাড়, ঘাস, মাঝে মাঝে কাফিরদের বস্তি। ক্রমে যেন মানুষের বাস কমে এল, এমন এক জায়গায় উপস্থিত এসে পৌঁছানো গেল, যেখানে এর আগে কখনো কোনো ইউরোপীয়ান আসেনি।

যেখানেই নদী বা খাল দেখি—কিংবা পাহাড় দেখি—সকলের আগে সোনার স্তরের সন্ধান করি। লোকে কত কি পেয়ে বড়মানুষ হয়ে গিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকায়, এ সম্বন্ধে বাল্যকাল থেকে কত কাহিনীই শুনে এসেছিলুম—সেই সব গল্পের মোহই আমায় আফ্রিকায় নিয়ে এসে ফেলেছিল। কিন্তু বৃথাই দু বৎসর ধরে নানাস্থানে ঘুরে বেড়ালুম। কত অসহ্য কষ্ট সহ্য করলুম এই দু বছরে। একবার তো সন্ধান পেয়েও হারালুম।

সেদিন একটা হরিণ শিকার করেছি সকালের দিকে। তাঁবু খাটিয়ে মাংস রান্না করে শুয়ে পড়লুম দুপুর বেলা—কারণ দুপুরের রোদে পথ চলা সে-সব জায়গায় একরকম অসম্ভব—১১৫° ডিগ্রী থেকে ১৩০° ডিগ্রী পর্যন্ত উত্তাপ হয় গ্রীষ্মকালে। বিশ্রামের পরে বন্দুক পরিষ্কার করতে গিয়ে দেখি বন্দুকের নলের মাছিটা কোথায় হারিয়ে গিয়েছে। মাছি না থাকলে রাইফেলের তাক ঠিক হয় না। কত এদিক ওদিক খুঁজেও মাছিটা পাওয়া গেল না। কাছেই একটা পাথরের ঢিবি, তার গায়ে সাদা সাদা কি একটা কঠিন পদার্থ চোখে পড়ল। ঢিবিটার গায়ে সেই জিনিসটা নানা স্থানে আছে। বেছে বেছে তারই একটা দানা সংগ্রহ করে ঘষে মেজে নিয়ে আপাততঃ সেটাকে মাছি করে রাইফেলের নলের আগায় বসিয়ে নিলাম। তারপর বৈকালে সেখান থেকে আবার উত্তর মুখে রওনা হয়েছি, কোথায় তাবু ফেলেছিলাম, সে কথা ক্রমেই ভুলে গিয়েছি।

দিন পনেরো পরে একজন ইংরেজের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল, সেও আমার মত সোনা খুঁজে বেড়াচ্ছে। তার সঙ্গে দুজন মাটাবেল কুলী ছিল। পরস্পরকে পেয়ে আমরা খুশি হলাম, তার নাম জিম কার্টার, আমারই মত ভবঘুরে, তবে তার বয়স আমার চেয়ে বেশী। জিম একদিন আমার বন্দুকটা নিয়ে পরীক্ষা করতে গিয়ে হঠাৎ কি দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল । আমায় বললে—বন্দুকের মাছি তোমার এ রকম কেন ? তার পর আমার গল্প শুনে সে উত্তেজিত হয়ে উঠল। বললে—তুমি বুঝতে পারোনি এ জিনিসটা খাঁটি রুপো, খনিজ রুপো! এ যেখানে পাওয়া যায়, সাধারণতঃ সেখানে রুপার খনি থাকে। আমার আন্দাজ হচ্ছে এক টন পাথর থেকে সেখানে অন্ততঃ ন'হাজার আউন্স রুপো পাওয়া যাবে। সে জায়গাতে এক্ষুনি চলো আমরা যাই। এবার আমরা লক্ষপতি হয়ে যাবো।

সংক্ষেপে বলি। তার পর কার্টারকে সঙ্গে নিয়ে আমি যে পথে এসেছিলাম, সেই পথে আবার গেলাম। কিন্তু চার মাস ধরে কত চেষ্টা, কত অসহ্য কষ্ট পেয়ে, কতবার বিরাট দিকদিশাহীন মরুভূমিবৎ ভেল্ডের মধ্যে পথ হারিয়ে, মৃত্যুর দ্বার পর্যন্ত পৌঁছেও, কিছুতেই আমি সে স্থান নির্ণয় করতেই পারলাম না। যখন সেখান থেকে সেবার তাঁবু উঠিয়ে দিয়েছিলাম, অত লক্ষ্য করিনি জায়গাটা। আফ্রিকার ভেল্ডে কোনো চিহ্ন বড় একটা থাকে না, যার সাহায্যে পুরানো জায়গা খুঁজে বার করা যায়—সবই যেন একরকম। অনেকবার হয়রান হয়ে শেষে আমরা রূপোর খনির আশা ত্যাগ করে গুয়াই নদীর দিকে চললাম। জিম্ কার্টার আমাকে আর ছাড়লে না, তার মৃত্যু পর্যন্ত আমার সঙ্গেই ছিল। তার সে শোচনীয় মৃত্যুর কথা ভাবলে এখনও আমার কষ্ট হয়। .

তৃষ্ণার কষ্টই এই ভ্রমণের সময় সব কষ্টের চেয়ে বেশী বলে মনে হয়েছে আমাদের কাছে । তাই এখন থেকে আমরা নদীপথ ধরে চলবো, এই স্থির করা গেল। বনের জন্তু শিকার করে খাই, আর মাঝে মাঝে কাফির বস্তি যদি পাই, সেখান থেকে মিষ্টি আলু, মুরগী প্রভৃতি সংগ্রহ করি।

একবার অরেঞ্জ নদী পার হয়ে প্রায় পঞ্চাশ মাইল দূরবর্তী একটা কাফির বস্তীতে আশ্রয় নিয়েছি, সেই দিন দুপুরের পরে কাফির বস্তীর মোড়লের মেয়ে হঠাৎ ভয়ানক অসুস্থ হয়ে পড়ল। আমরা দেখতে গেলাম—পাঁচ ছ' বছরের একটা ছোট্ট উলঙ্গ মেয়ে মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি দিচ্ছে তার পেটে নাকি ভয়ানক ব্যথা। সবাই কাঁদছে ও দাপাদাপি করছে। মেয়েটার ঘাড়ে নিশ্চয়ই দানো চেপেছে—ওকে মেরে না ফেলে ছাড়বে না। তাকে ও তার বাপ মাকে জিজ্ঞাসা করে এইটুকু জানা গেল, সে বনের ধারে গিয়েছিল—তার পর থেকে তাকে ভূতে পেয়েছে। আমি ওর অবস্থা দেখে বুঝলাম কোনো বনের ফল বেশী পরিমাণে খেয়ে ওর পেট কামড়াচ্ছে। তাকে জিজ্ঞাসা করা হল, কোনো বনের ফল সে খেয়েছিল কিনা ? সে বললে—হ্যাঁ, খেয়েছিল। কাঁচা ফল ? মেয়েটা বললে—ফল নয়, ফলের বীজ। সে ফলের বীজই খাদ্য।

এক ডোজ হোমিওপ্যাথিক ওষুধে তার ভূত ছেড়ে গেল। আমাদের সঙ্গে ওষুধের বাক্স ছিল। গ্রামে আমাদের খাতির হয়ে গেল খুব। পনেরো দিন আমরা সে গ্রামের সর্দারের অতিথি হয়ে রইলাম। ইলান্ড হরিণ শিকার করি আর রাত্রে কাফিরদের মাংস খেতে নিমন্ত্রণ করি। বিদায় নেবার সময় কাফির সর্দার বললে—তোমরা সাদা পাথর খুব ভালবাস—না ? বেশ খেলবার জিনিস। নেবে সাদা পাথর ? দাঁড়াও দেখাচ্ছি। একটু পরে সে একটা ডুমুর ফলের মত বড় সাদা পাথর আমাদের হাতে এনে দিলে। জিম ও আমি বিস্ময়ে চমকে উঠলুম—জিনিসটা হীরক!....খনি বা খনির ওপরকার উপলাকীর্ণ মৃত্তিকাস্তর থেকে প্রাপ্ত পালিশ-না-করা হীরকখণ্ড !

কাফির সর্দার বললে—এটা তোমরা নিয়ে যাও। ঐ যে দূরের বড় পাহাড় দেখছো, ধোঁয়া ধোঁয়া—এখান থেকে হেঁটে গেলে একটা চাঁদের মধ্যে ওখানে পৌঁছে যাবে। ঐ পাহাড়ের মধ্যে এ রকম সাদা পাথর অনেক আছে বলে শুনেছি। আমরা কখনো যাইনি, জায়গা ভাল নয়, ওখানে বুনিপ্ বলে উপদেবতা থাকে। অনেক চাঁদ আগেকার কথা, আমাদের গ্রামের তিনজন সাহসী লোক কারো বারণ না শুনে ঐ পাহাড়ে গিয়েছিল, আর ফেরেনি। আর একবার একজন তোমাদের মত সাদা মানুষ এসেছিল, সেও অনেক, অনেক চাঁদ আগে। আমরা দেখিনি, আমাদের বাপ-ঠাকুরদাদাদের আমলের কথা। সে গিয়ে আর ফেরেনি।।

কাফির গ্রাম থেকে বার হয়েই পথে আমরা ম্যাপ মিলিয়ে দেখলাম—দূরের ধোঁয়া-ধোঁয়া অস্পষ্ট ব্যাপারটা হচ্ছে রিখ্টারসভেল্ড পর্বতশ্রেণী—দক্ষিণ আফ্রিকার সর্বাপেক্ষা বন্য, অজ্ঞাত, বিশাল ও বিপদসঙ্কুল অঞ্চল। কোনো সভ্য মানুষ সে অঞ্চলে পদার্পণ করেনি—দু-একজন দুর্ধর্ষ দেশ-আবিষ্কারক বা ভৌগোলিক বিশেষজ্ঞ ছাড়া। ঐ বিস্তীর্ণ বনপর্বতের অধিকাংশ স্থানই সম্পূর্ণ অজানা, তার ম্যাপ নেই, তার কোথায় কি আছে কেউ বলতে পারে না।

জিম্ কার্টার ও আমার রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠল—আমরা দুজনেই তখনি স্থির করলাম ওই অরণ্য ও পর্বতমালা আমাদেরই আগমন প্রতীক্ষায় তার বিপুল রত্নভাণ্ডার লোকচক্ষুর আড়ালে গোপন করে রেখেছে। আমরা ওখানে যাবোই।

কাফির গ্রাম থেকে রওনা হবার প্রায় সতেরো দিন পরে আমরা পর্বতশ্রেণীর পাদদেশের নিবিড় বনে প্রবেশ করলাম।

পূর্বেই বলেছি দক্ষিণ আফ্রিকার অত্যন্ত দুর্গম প্রদেশে এই পর্বতশ্রেণী অবস্থিত। জঙ্গলের কাছাকাছি কোনো কাফির বস্তি পর্যন্ত আমাদের চোখে পড়ল না। জঙ্গল দেখে মনে হল কাঠুরিয়ার কুঠার আজ পর্যন্ত এখানে প্রবেশ করেনি।।

সন্ধ্যার কিছু পূর্বে আমরা জঙ্গলের ধারে এসে পৌঁছেছিলাম। জিম্ কার্টারের পরামর্শ মত সেখানেই আমরা রাত্রের বিশ্রামের জন্য তাঁবু খাটালাম। জিম্ জঙ্গলের কাঠ কুড়িয়ে আগুন জ্বাললে—আমি লাগলুম রান্নার কাজে। সকালের দিকে একজোড়া পাখী মেরেছিলাম, সেই পাখী ছাড়িয়ে তার রোস্ট্ করবো এই ছিল মতলব। পাখী ছাড়ানোর কাজে একটু ব্যস্ত আছি—এমন সময় জিম্ বললে—পাখী রাখো। দু পেয়ালা কফি করো তো আগে।।

আগুন জ্বালাই ছিল। জল গরম করতে দিয়ে আবার পাখী ছাড়াতে বসেছি, এমন সময় সিংহের গর্জন একেবারে অতি নিকটে শোনা গেল। জিম বন্দুক নিয়ে বেরুল, আমি বললাম—অন্ধকার হয়ে আসছে, বেশী দূর যেও না। তার পরে আমি পাখী ছাড়াচ্ছি—কিছু দূরে জঙ্গলের বাইরেই দু-বার বন্দুকের আওয়াজ শুনলুম। একটুখানি থেমে আবার আর একটা আওয়াজ। তার পরেই সব চুপ। মিনিট দশ কেটে গেল, জিম্ আসে না দেখে আমি নিজের রাইফেলটা নিয়ে যেদিকে থেকে আওয়াজ এসেছিল, সেদিকে একটু যেতেই দেখি জিম আসছে—পেছনে কি একটা ভারী মত টেনে আনছে। আমায় দেখে বললে—ভারী চমৎকার ছালখানা। জঙ্গলের ধারে ফেলে রাখলে হায়নাতে সাবাড় করে দেবে। তাঁবুর কাছে টেনে নিয়ে যাই চল।

দুজনে টেনে সিংহের প্রকাণ্ড দেহটা তাঁবুর আগুনের কাছে নিয়ে এসে ফেললাম। তার পর ক্রমে রাত হল। খাওয়া-দাওয়া সেরে আমরা শুয়ে পড়লুম।

অনেক রাত্রে সিংহের গর্জনে ঘুম ভেঙে গেল। তাঁবু থেকে অল্প দূরেই সিংহ ডাকছে। অন্ধকারে বোঝা গেল না ঠিক কতদূরে। আমি রাইফেল্ নিয়ে বিছানায় উঠে বসলাম। জিম্ শুধু একবার বললে—সন্ধ্যাবেলার সেই সিংহটার জুড়ি।।

বলেই সে নির্বিকার ভাবে পাশ ফিরে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। আমি তাঁবুর বাইরে এসে দেখি আগুন নিবে গিয়েছে, পাশে কাঠকুটো ছিল, তাই দিয়ে আবার জোর আগুন জ্বাললাম। তার পরে আবার এসে শুয়ে পড়লাম।

পরদিন সকালে উঠে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গেলাম। কিছুদূর গিয়ে জনকয়েক কাফিরের সঙ্গে দেখা হোল। তারা হরিণ শিকার করতে এসেছে। আমরা তাদের তামাকের লোভ দেখিয়ে কুলী ও পথপ্রদর্শক হিসেবে সঙ্গে নিতে চাইলাম।

তারা বললে—তোমরা জানো না তাই ও কথা বলছ। এ জঙ্গলে মানুষ আসে না। যদি বাঁচতে চাও তো ফিরে যাও। ঐ পাহাড়ের শ্রেণী অপেক্ষাকৃত নীচু, ওটা পার হয়ে মধ্যে খানিকটা সমতল জায়গা আছে, ঘন বনে ঘেরা, তার ওদিকে আবার এর চেয়েও উঁচু পর্বতশ্রেণী । ঐ বনের মধ্যের সমতল জায়গাটা বড় বিপজ্জনক, ওখানে বুনিপ্ থাকে। বুনিপের হাতে পড়লে আর ফিরে আসতে হবে না। ওখানে কেউ যায় না। আমরা তামাকের লোভে ওখানে যাবো মরতে ? ভালো চাও তো তোমরাও যেও না।

আমরা জিজ্ঞাসা করলাম—বুনিপ্ কি ?

তারা জানে না। তবে তারা স্পষ্ট বুঝিয়ে দিলে বুনিপ্ কি, না জানলেও সে কি অনিষ্ট করতে পারে সেটা তারা খুব ভাল রকমই জানে ।।

ভয় আমাদের ধাতে ছিল না, জিম কার্টারের তো একেবারেই না। সে আরও বিশেষ করে জেদ ধরে বসল। এই বুনিপের রহস্য তাকে ভেদ করতে হবে—হীরা পাই বা না-পাই । মৃত্যু যে তাকে অলক্ষিতে টানছে, তখনও যদি বুঝতে পারতাম !

বৃদ্ধ এই পর্যন্ত বলে একটু হাঁপিয়ে পড়ল। শঙ্করের মনে তখন অত্যন্ত কৌতূহল হয়েছে, এ ধরনের কথা সে কখনও আর শোনেনি। মুমূর্ষ ডিয়েগো আল্ভারেজের জীর্ণ পরিচ্ছদ ও শিরাবহুল হাতের দিকে চেয়ে, তার পাকা ভুরু জোড়ার নীচেকার ইস্পাতের মত নীল দীপ্তিশীল চোখ দুটোর দিকে চেয়ে, শঙ্করের মন শ্রদ্ধায় ও ভালবাসায় ভরে উঠল।

সত্যিকার মানুষ বটে একজন !

আল্ভারেজ্ বললে—আর এক গ্লাস জল—

জল পান করে বৃদ্ধ আবার বলতে শুরু করলে—

হ্যাঁ, তার পরে শোনো ! ঘোর বনের মধ্যে আমরা প্রবেশ করলাম। কত বড় বড় গাছ, বড় বড় ফার্ন, কত বিচিত্র বর্ণের অর্কিড্ ও লায়ানা, স্থানে স্থানে সে বন নিবিড় ও দুষ্প্রবেশ্য। বড় বড় গাছের নীচেকার জঙ্গল এতই ঘন বঁড়শির মত কাঁটা গাছের গায়ে, মাথার ওপরকার পাতায় পাতায় এমন জড়াজড়ি যে সূর্যের আলো কোনো জন্মে সে জঙ্গলে প্রবেশ করে কিনা সন্দেহ। আকাশ দেখা যায় না। অত্যন্ত বেবুনের উৎপাত জঙ্গলের সর্বত্র, বড় গাছের ডালে দলে দলে শিশু, বালক, বৃদ্ধ, যুবা নানারকমের বেবুন বসে আছে—অনেক সময় দেখলাম মানুষের আগমন তারা গ্রাহ্য করে না। দাঁত খিচিয়ে ভয় দেখায়—দু-একটা বুড়ো সর্দার বেবুন সত্যিই

হিংস্র প্রকৃতির, হাতে বন্দুক না থাকলে তারা অনায়াসেই আমাদের আক্রমণ করত। জিম কার্টার বললে—অন্ততঃ আমাদের খাদ্যের অভাব হবে না কখনো এ জঙ্গলে।

সাত-আটদিন সেই নিবিড় জঙ্গলে কাটল। জিম্ কার্টার ঠিকই বলেছিল, প্রতিদিন একটা করে বেবুন আমাদের খাদ্য যোগান দিতে দেহপাত করত। উঁচু পাহাড়টা থেকে জঙ্গলের নানাস্থানে ছোট বড় ঝরণা নেমে এসেছে, সুতরাং জলের অভাবও ঘটল না। একবার কিন্তু এতে বিপদও ঘটেছিল। একটা ঝরনার ধারে দুপুরবেলা এসে আগুন জ্বেলে বেবুনের দাপ্না ঝল্সাবার ব্যবস্থা করছি, জিম্ গিয়ে তৃষ্ণার ঝোঁকে ঝরনার জল পান করলে। তার একটু পরেই তার ক্রমাগত বমি হতে শুরু করল। পেটে ভয়ানক ব্যথা। আমি একটু বিজ্ঞান জানতাম, আমার সন্দেহ হওয়াতে ঝরণার জল পরীক্ষা করে দেখি, জলে খনিজ আর্সেনিক মেশানো আছে। ওপর পাহাড়ের আর্সেনিকের স্তর ধুয়ে নেমে আসছে নিশ্চয়ই। হোমিওপ্যাথিক বাক্স থেকে প্রতিষেধক ওষুধ দিতে সন্ধ্যার দিকে জিম সুস্থ হয়ে উঠল।

বনের মধ্যে ঢুকে কেবল এক বেবুন ও মাঝে মাঝে দু-একটা বিষধর সাপ ছাড়া অন্য কোনো বন্যজন্তুর সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হয়নি । পাখীর কথা আর প্রজাপতির কথা অবশ্য বাদ দিলাম। কারণ এই সব ট্রপিক্যাল জঙ্গল ছাড়া এত বিচিত্র বর্ণের ও শ্রেণীর পাখী ও প্রজাপতি আর কোথাও দেখতে পাওয়া যাবে না। বিশেষ করে বন্যজন্তু বলতে যা বোঝায়, তারা সে পর্যায়ে পড়ে না।

প্রথমেই রিখ্টারস্ভেল্ড পর্বতশ্রেণীর একটা শাখা পর্বত আমাদের সামনে পড়ল, সেটা মূল ও প্রধান পর্বতের সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে অবস্থিত বটে, কিন্তু অপেক্ষাকৃত নীচু। সেটা পার হয়ে আমরা একটা বিস্তীর্ণ বনময় উপত্যকায় নেমে তাঁবু ফেললাম। একটা ক্ষুদ্র নদী উপত্যকার মধ্যে দিয়ে বয়ে গিয়েছে। নদী দেখে আমার ও জিমের আনন্দ হল, এই সব নদীর তীর থেকেই অনেক সময় খনিজ দ্রব্যের সন্ধ্যান পাওয়া যায়।।

নদীর নানাদিকে আমরা বালি পরীক্ষা করে বেড়াই, কিছুই কোথাও পাওয়া যায় না। সোনার একটা রেণু পর্যন্ত নেই নদীর বালিতে। আমরা ক্রমে হতাশ হয়ে পড়লাম। তখন প্রায় কুড়ি-বাইশ দিন কেটে গিয়েছে। সন্ধ্যার সময় কফি খেতে খেতে জিম্ বললে, দেখ, আমার মন বলছে এখানে আমরা সোনার সন্ধান পাব। থাকো এখানে আর কিছুদিন।।

আরও কুড়িদিন কাটল। বেবুনের মাংস অসহ্য ও অত্যন্ত অরুচিকর হয়ে উঠেছে। জিমের মত লোকও হতাশ হয়ে পড়ল। আমি বললাম—আর কেন জিম্, চল ফিরি এবার। কাফির গ্রামে আমাদের ঠকিয়েছে। এখানে কিছু নেই।

জিম্ বললে—এই পর্বতশ্রেণীর নানা শাখা আছে, সবগুলো না দেখে যাবো না।

একদিন পাহাড়ী নদীটার খাতের ধারে বসে বালি চালতে চালতে পাথরে নুড়ির রাশির মধ্যে অর্ধপ্রোথিত একখানা হলদে রঙের ছোট পাথর আমি ও জিম্ একসঙ্গেই দেখতে পেলাম। দুজনেই তাড়াতাড়ি সেটা খুঁড়ে তুললাম। আমাদের মুখ আনন্দে ও বিস্ময়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। জিম বললে—ডিয়েগো, পরিশ্রম এতদিনে সার্থক হল—চিনেছ তো ?

আমিও বুঝেছিলাম। বললাম হ্যাঁ। কিন্তু নদীস্রোতে ভেসে আসা জিনিসটা। খনির অস্তিত্ব নেই এখানে।

পাথরখানা দক্ষিণ আফ্রিকার বিখ্যাত হলদে রঙের হীরকের জাত। অবশ্য খুব আনন্দের কোনো কারণ ছিল না, কারণ এতে মাত্র এটাই প্রমাণ হয় যে, এই বিশাল পর্বতশ্রেণীর কোনো অজ্ঞাত, দুর্গম অঞ্চলে হলদে হীরকের খনি আছে। নদীস্রোতে ভেসে এসেছে তা থেকে একটা স্তরের একটা টুকরো। সে মূল খনি খুঁজে বার করা অমানুষিক পরিশ্রম, ধৈর্য ও সাহস-সাপেক্ষ।

সে পরিশ্রম, সাহস ও ধৈর্যের অভাব আমাদের ঘটত না, কিন্তু যে দৈত্য ঐ রহস্যময় বনপর্বতের অমূল্য হীরকখনির প্রহরী, সে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে আমাদের বাধা দিলে।

একদিন আমরা বনের মধ্যে একটা পরিষ্কার জায়গায় বসে সন্ধ্যার দিকে বিশ্রাম করছি, আমাদের সামনে পরিষ্কার জায়গাতে একটা তালগাছ, তালগাছের তলায় খুঁড়িটা ঘিরে খুব ঘন বন-ঝোপ। হঠাৎ আমরা দেখলাম কিসে যেন অত বড় তালগাছটা এমন নাড়া দিচ্ছে যে, তার ওপরকারের শুকনো ডালপালাগুলো খর্খর্ করে নড়ে উঠছে, যেমন নড়ে ঝড় লাগলে। গাছটাও সেই সঙ্গে নড়ছে।

আমরা আশ্চর্য হয়ে গেলাম। বাতাস নেই কোনোদিকে, অথচ তালগাছটা নড়ছে কেন ? আমাদের মনে হল কে যেন তালগাছের গুঁড়িটা ধরে ঝাঁকি দিচ্ছে। জিম তখুনি ব্যাপারটা কি দেখতে গুঁড়ির তলায় সেই জঙ্গলটার মধ্যে ঢুকলো।।

সে ওর মধ্যে ঢুকবার অল্পক্ষণ পরেই আমি একটা আর্তনাদ শুনতে পেয়ে রাইফেল নিয়ে ছুটে গেলুম—ঝোপের মধ্যে ঢুকে দেখি জিম্ রক্তাক্ত দেহে বনের মধ্যে পড়ে আছে—কোন ভীষণ বলবান জন্তুতে তার মুখের সামনে থেকে বুক পর্যন্ত ধারালো নখ দিয়ে চিরে ফেঁড়ে ফেলেছে—যেমন পুরানো বালিশ ফেঁড়ে তুলো বার করে, তেমনি। জিম শুধু বললে—সাক্ষাৎ শয়তান—মূর্তিমান শয়তান-

হাত দিয়ে ইঙ্গিত করে বললে—পালাও—পালাও।

তার পরেই জিম্ মারা গেল। তালগাছের গায়ে দেখি যেন কিসের মোটা ও শক্ত চোঁচ লেগে আছে। আমার মনে হল কোন ভীষণ বলবান জানোয়ার তালগাছের গায়ে গা ঘষছিল, গাছটা ওরকম নড়ছিল সে জন্যেই। জন্তুটার কোনো পাত্তা পেলাম না। জিমের দেহ ফাঁকা জায়গায় বার করে আমি রাইফেল হাতে ঝোপের ওপারে গেলুম। সেখানে গিয়ে দেখি মাটির ওপরে কোনো অজ্ঞাত জন্তুর পায়ের চিহ্ন, তার মোটে তিনটে আঙ্গুল পায়ে— কিছুদুর গেলাম পায়ের চিহ্ন অনুসরণ করে, জঙ্গলের মধ্যে কিছুদূর গিয়ে একটা গুহার মুখে পদচিহ্ন ঢুকে গেল। গুহার প্রবেশপথের কাছে শুকনো বালির ওপরে ওই অজ্ঞাত ভয়ঙ্কর জানোয়ারটাও বড় বড় তিন-আঙ্গুলে থাবার দাগ রয়েছে।

তখন অন্ধকার হয়ে এসেছে। সেই জনহীন অরণ্যভূমি ও পর্বত-বেষ্টিত অজ্ঞাত উপত্যকায় একা দাঁড়িয়ে আমি এক অজ্ঞাততর ভীষণ বলবান জন্তুর অনুসরণ করছি। ডাইনে চেয়ে দেখি প্রায়ান্ধকার সন্ধ্যায় সুউচ্চ ব্যাসাল্টর দেওয়াল খাড়া উঠেছে প্রায় চার হাজার ফুট, বনে বনে নিবিড়, খুব উঁচুতে পর্বতের বাঁশবনের মাথায় সামান্য যেন একটু রাঙা রোদ—কিম্বা হয়তো আমার চোখের ভুল, অনন্ত আকাশের আভা পড়ে থাকবে।

ভাবলাম, এ সময় গুহার মধ্যে ঢোকা বা এখানে দাঁড়িয়ে থাকা বিবেচনার কাজ হবে না

জিমের দেহ নিয়ে তাঁবুতে ফিরে এলুম। সারারাত তার মৃতদেহ নিয়ে আগুন জ্বেলে রাইফেল্ তৈরী রেখে বসে রইলুম।

পরদিন জিমকে সমাধিস্থ করে আবার ওই জানোয়ারটার খোঁজে বার হলাম। কিন্তু মুশকিল এই যে, সে গুহা এবং সেই তালগাছটা পর্যন্ত অনেক খুঁজেও কিছুতেই বার করতে পারলুম না। ও রকম অনেক গুহা আছে পর্বতের নানা জায়গায়। সন্ধ্যার অন্ধকারে কোন্ গুহা দেখেছিলাম কে জানে ?

সঙ্গীহীন অবস্থায় সেই মহাদুর্গম রিখ্টারস্ভেল্ড পর্বতশ্রেণীর বনের মধ্যে থাকা চলে না। পনেরো দিন হেঁটে সেই কাফির বস্তিতে পৌঁছলাম। তারা চিনতে পারলে, খুব খাতির করলে। তাদের কাছে জিমের মৃত্যু-কাহিনী বললুম।

শুনে তাদের মুখ ভয়ে কেমন হয়ে গেল—ছোট ছোট চোখ ভয়ে বড় হয়ে উঠল। বললে—সর্বনাশ ! বুনিপ্ ! এই ভয়েই ওখানে কেউ যায় না।

কাফির বস্তি থেকে আর পাঁচ দিন হেঁটে অরেঞ্জ নদীর ধারে একখানা ডাচ লঞ্চ পেলাম। তাতে করে এসে সভ্য জগতে পৌঁছুলাম।

আমি আর কখনো রিখ্টারস্ভেল্ড পর্বতের দিকে যেতে পারিনি। চেষ্টা করেছিলাম অনেক। কিন্তু বুয়র যুদ্ধ এসে পড়ল। যুদ্ধে গেলাম। আহত হয়ে প্রিটোরিয়ার হাসপাতালে অনেকদিন রইলাম। তার পর সেরে উঠে একটা কমলালেবুর বাগানে কাজ পেয়ে সেখানেই এতদিন ছিলাম।

বছর চার-পাঁচ শান্ত জীবন যাপন করবার পরে, ভালো লাগলো না, তাই আবার বার হয়েছিলাম। কিন্তু বয়েস হয়ে গিয়েছে অনেক, ইয়্যাং ম্যান, এবার আমার চলা বোধ হয় ফুরুবে।

এই ম্যাপখানা তুমি রাখো। এতে রিখ্টারস্ভেল্ড পর্বত ও যে নদীতে আমরা হীরা পেয়েছিলাম, মোটামুটি ভাবে আঁকা আছে। সাহস থাকে, সেখানে যেও, বড় মানুষ হবে। বুয়র যুদ্ধের পর ওই অঞ্চলে ওয়াই নদীর ধারে দু-একটা ছোট বড় হীরার খনি বেরিয়েছে। কিন্তু আমরা যেখানে হীরা পেয়েছিলুম তার সন্ধান কেউ জানে না। যেও তুমি।। ডিয়েগো আল্ভারেজ গল্প শেষ করে আবার অবসন্ন ভাবে বালিশের গায়ে ভর দিয়ে শুয়ে পড়ল।

পাঁচ

শঙ্করের সেবাশুশ্রূষার গুণে ডিয়েগো আল্‌ভারেজ সেযাত্রা সেরে উঠল এবং দিন পনেরো শঙ্কর তাকে নিজের কাছেই রাখলে । কিন্তু চিরকাল যে পথে পথে বেড়িয়ে এসেছে, ঘরে তার মন বসে না। একদিন সে যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। শঙ্কর নিজের কর্তব্য ঠিক করে ফেলেছিল। বললে, চল, তোমার অসুখের সময় যে-সব কথা বলেছিলে, মনে আছে ? সেই হল্‌দে হীরের খনি?

অসুখের ঝোঁকে আল্‌ভারেজ যে-সব কথা বলেছিল, এখন সে সম্বন্ধে বৃদ্ধ আর কোনো কথাটি বলে না। বেশীর ভাগ সময় চুপ করে কি যেন ভাবে । শঙ্করের কথার উত্তরে বৃদ্ধ বললে—আমিও কথাটা যে না ভেবে দেখেছি, তা মনে কোরো না। কিন্তু আলেয়ার পেছনে ছুটবার সাহস আছে তোমার ?

শঙ্কর বললে—আছে কিনা দেখতে দোষ কি? আজই বলো তো মাভো স্টেশনে তার করে আমার বদলে অন্য লোক পাঠাতে বলি।

আল্‌ভারেজ কিছু না ভেবেই বললে—কর তার। কিন্তু আগে বুঝে দেখো। যারা সোনা বা হীরা খুঁজে বেড়ায় তারা সব সময় তা পায় না। আমি আশী বছরের এক বুড়ো লোককে জানতাম, সে কখনো কিছু পায়নি তবে প্রতিবারই বলতো, এইবার ঠিক সন্ধান পেয়েছি, এইবার পাবো ! আজীবন অস্ট্রেলিয়ার মরুভূমিতে আর আফ্রিকার ভেল্ডে প্রস্‌পেকটিং করে বেড়িয়েছে।

আরও দিন দশেক পরে দুজনে কিসুমু গিয়ে ভিক্টোরিয়া নায়াগ্রা হ্রদে স্টীমার চড়ে দক্ষিণ মুখে মোয়ান্‌জার দিকে যাবে ঠিক করলে।

পথে এক জায়গায় বিস্তীর্ণ প্রান্তরে হাজার হাজার জেব্রা, জিরাফ, হরিণ চরতে দেখে শঙ্কর তো অবাক। এমন দৃশ্য সে আর কখনো দেখেনি। জিরাফগুলো মানুষকে আদৌ ভয় করে না, পঞ্চাশ গজ তফাতে দাঁড়িয়ে ওদের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল।

আল্‌ভারেজ্‌ বলল—আফ্রিকার জিরাফ মারবার জন্যে গবর্নমেন্টের কাছ থেকে বিশেষ লাইসেন্স নিতে হয়। যে সে মারতে পারে না। সেজন্যে মানুষকে ওদের তত ভয় নেই।

হরিণের দল কিন্তু বড় ভীরু, এক এক দলে দু-তিনশো হরিণ চরছে, ওদের দেখে ঘাস খাওয়া ফেলে মুখ তুলে একবার চাইলে, তার পরক্ষণেই মাঠের দূর প্রান্তের দিকে সবাই চার পা তুলে দৌড়।

কিসুমু থেকে স্টীমার ছাড়ল—এটা ব্রিটিশ স্টীমার, ওদের পয়সা নেই বলে ডেক-এ যাচ্ছে। নিগ্রো মেয়েরা পিঠে ছেলেমেয়ে বেঁধে মুরগী নিয়ে স্টীমারে উঠেছে। মাসাই কুলীরা ছুটি নিয়ে দেশে যাচ্ছে—সঙ্গে নাইরোবি শহর থেকে কাঁচের পুঁতি, কম দামের খেলো আয়না, ছুরি প্রভৃতি নানা জিনিস।

স্টীমার থেকে নেমে আবার ওরা পথ চলে। ভিক্টোরিয়া হ্রদের যে বন্দরে ওরা নামলে—তার নাম মোওয়ান্‌জা—এখান থেকে তিনশো মাইল দূরে ট্যাবোরা, সেখানে পৌঁছে কয়েক দিন বিশ্রাম করে ওরা যাবে টাঙ্গানিয়াকা হ্রদের তীরবর্তী উজিজি বন্দরে।

এই পথে যাবার সময় আলভারেজ বললে—টাঙ্গানিয়াকার মধ্যে দিয়ে যাওয়া বড় বিপজ্জনক ব্যাপার। এখানে এক রকম মাছি আছে, তা কামড়ালে স্লিপিং সিকনেস্‌ হয়। স্লিপিং সিক্‌নেসের মড়কে টাঙ্গানিয়াকা জনশূন্য হয়ে পড়েছে। মোওয়ান্‌জা থেকে ট্যাবোরার পথে সিংহের ভয়ও খুব বেশী। প্রকৃতপক্ষে আফ্রিকার এই অঞ্চলও সিংহের রাজ্য' বলা চলে।

শহর থেকে দশ মাইল দূরে পথের ধারে একটা ছোট খড়ের বাংলো। সেখানে এক ইউরেশীয় শিকারী আশ্রয় নিয়েছে। আল্‌ভারেজকে সে খুব খাতির করলে। শঙ্করকে দেখে বললে—একে পেলে কোথায় ? এ তো হিন্দু !

তোমার কুলী ?

আল্‌ভারেজ বললে—আমার ছেলে ।।

সাহেব আশ্চর্য হয়ে বললে—কি রকম?

আল্‌ভারেজ আনুপূর্বিক সব বর্ণনা করলে, তার রোগের কথা, শঙ্করের সেবাশুশ্রূষার কথা। কেবল বললে না কোথায় যাচ্ছে ও কি উদ্দেশ্যে যাচ্ছে।

সাহেব হেসে বললে—বেশ ভালো। ওর মুখ দেখে মনে হয় ওর মনে সাহস ও দয়া দুইই আছে। ইস্ট ইন্ডিজের হিন্দুরা লোক হিসেবে ভালোই বটে। একবার ইউগান্ততে একজন শিখ আমার প্রতি এমন সুন্দর আতিথ্য দেখিয়েছিল, তা কখনো ভুলতে পারবো না। আজ তোমরা এসো, রাত সামনে, আমার এখানেই রাত্রি যাপন করো। এটা গবর্নমেন্টের ডাকবাংলো। আমিও তোমাদের মত সারাদিন পথ চলে বিকেলের দিকে এসে উঠেছি।

সাহেবের একটা ছোট গ্রামোফোন আছে, সন্ধ্যার পরে টিনবন্দী বিলাতী টোমাটোর ঝোল ও সার্ডিন মাছ সহযোগে সান্ধ্যভোজন সমাপ্ত করার পরে সবাই বাংলোর বাইরে ক্যাম্পচেয়ারে শুয়ে রেকর্ড শুনে যাচ্ছে, এমন সময় অল্প দূরে সিংহের গর্জন শোনা গেল। বোধ হল, মাটির কাছে মুখ নামিয়ে সিংহ গর্জন করছে—কারণ মাটি যেন কেঁপে কেঁপে উঠছে। সাহেব বললে—টাঙ্গানিয়াকায় বেজায় সিংহের উপদ্রব আর বড় হিংস্র এরা। প্রায় অধিকাংশ সিংহই মানুষখেকো। মানুষের রক্তের আস্বাদ একবার পেয়েছে, এখন মানুষ ছাড়া আর কিছু চায় না।

শঙ্কর ভাবলে খুব সুসংবাদ বটে। ইউগান্ডা রেলওয়ে তৈরী হবার সময়ে সে সিংহের উপদ্রব কাকে বলে খুব ভালই দেখেছে।

পরদিন সকালে ওরা আবার রওনা হল, সাহেব বলে দিলে সূর্য উঠে গেলে খুব সাবধানে থাকবে। স্লিপিং সিক্‌নেসের মাছি রোদ উঠলেই জাগে। গায়ে যেন না বসে।

দীর্ঘ দীর্ঘ ঘাসের বনের মধ্যে দিয়ে সুঁড়িপথ। আলভারেজ বললে—খুব সাবধান, এই সব ঘাসের বনেই সিংহের আড্ডা। বেশী পেছনে থেকো না।

আল্‌ভারেজের বন্দুক আছে, এই একটা ভরসা। আর একটা ভরসা এই যে, আল্‌ভারেজ যাকে বলে 'ক্র্যাক শট', তাই। অর্থাৎ তার গুলি বড় একটা ফসকায় না। কিন্তু অত বড় অব্যথ-লক্ষ্য শিকারীর সঙ্গে থেকেও শঙ্কর বিশেষ ভরসা পেলে না, কারণ ইউগান্তর অভিজ্ঞতা থেকে সে জানে, সিংহ যখন যাকে নেবে, এমন সম্পূর্ণ অতর্কিতেই নেবে, যে পিঠের রাইফেলের চামড়ার স্ট্র্যাপ খোলবার অবকাশ পর্যন্ত দেবে না।

সেদিন সন্ধ্যা হবার ঘণ্টাখানেক আগে দূরবিস্তীর্ণ প্রান্তরের মধ্যে রাত্রের বিশ্রামের জন্য স্থান নির্বাচন করে নিতে হল। আল্‌ভারেজ বললে—সামনে কোনো গ্রাম নেই—অন্ধকারের পর এখানে পথ চলা ঠিক নয়।

একটা সুবৃহৎ বাওবাব্ গাছের তলায় দু টুকরো কেম্বিস ঝুলিয়ে ছোট্ট একটু তাঁবু খাটানো হল। কাঠকুটো কুড়িয়ে আগুন জ্বালিয়ে রাত্রের খাবার তৈরী করতে বসল শঙ্কর। তারপর সমস্ত দিন পরিশ্রমের পরে দুজনেই শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

অনেক রাত্রে আল্‌ভারেজ ডাকলে—শঙ্কর, ওঠো।

শঙ্কর ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসল।

আল্‌ভারেজ বললে—কি একটা জানোয়ার তাঁবুর চারিপাশে ঘুরছে বন্দুক বাগিয়ে রাখো।

সত্যিই একটা কোনো অজ্ঞাত বৃহৎ জন্তুর নিঃশ্বাসের শব্দ তাঁবুর পাতলা কেম্বিসের পর্দার বাইরেই শোনা যাচ্ছে বটে। তাঁবুর সামনে সন্ধ্যায় যে আগুন করা হয়েছিল—তা স্বল্পাবশিষ্ট আলোকে সুবৃহৎ বাওবাব্ গাছটা একটা ভীষণদর্শন দৈত্যের মত দেখাচ্ছে। শঙ্কর বন্দুক নিয়ে বিছানা থেকে নামবার চেষ্টা করতে বৃদ্ধ বারণ করলে।

পরক্ষণেই জানোয়ারটা হুড়মুড় করে তাঁবুটা ঠেলে তাঁবুর মধ্যে ঢুকবার চেষ্টা করবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁবুর পর্দার ভেতর থেকেই আল্‌ভারেজ পর পর দু-বার রাইফেল ছুঁড়লে। শব্দটা লক্ষ্য করে শঙ্করও সেই মুহূর্তে বন্দুক ওঠালে। কিন্তু শঙ্কর ঘোড়া টেপবার আগে আল্‌ভারেজের রাইফেল আর একবার আওয়াজ করে উঠল।

তার পরেই সব চুপ।

ওরা টর্চ জ্বেলে সন্তর্পণে তাঁবুর বাইরে এসে দেখলে তাঁবুর পূর্বদিকের পর্দার বাইরে পর্দাটা খানিকটা ঠেলে ভেতরে ঢুকেছে এক প্রকাণ্ড সিংহ।

সেটা তখনও মরেনি, কিন্তু সাংঘাতিক আহত হয়েছে। আরও দু-বার গুলি খেয়ে সেটা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলে।

আল্‌ভারেজ আকাশের নক্ষত্রের দিকে চেয়ে বললে রাত এখনো অনেক। ওটা এখানে পড়ে থাক। চল আমরা আমাদের ঘুম শেষ করি।

দুজনেই এসে শুয়ে পড়ল—একটু পরে শঙ্কর বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করলে আল্‌ভারেজের নাসিকা-গর্জন শুরু হয়েছে। শঙ্করের চোখে ঘুম এল না।

আধঘণ্টা পরে শঙ্করের মনে হল, আল্‌ভারেজের নাসিকা-গর্জনের সঙ্গে পাল্লা দেবার জন্যে টাঙ্গানিয়াকা অঞ্চলের সমস্ত সিংহ যেন একযোগে ডেকে উঠল । সে কি ভয়ানক সিংহের ডাক !....আগেও শঙ্কর অনেকবার সিংহগর্জন শুনেছে, কিন্তু এ রাত্রের সে ভীষণ বিরাট গর্জন তার চিরকাল মনে ছিল। তা ছাড়া ডাক তাঁবু থেকে বিশ হাতের মধ্যে।

আল্‌ভারেজ আবার জেগে উঠল। বললে—নাঃ, রাত্রে দেখছি একটু ঘুমুতে দিলে না। আগের সিংহটার জোড়া। সাবধান থাকো। বড় পাজী জানোয়ার।

কি দুর্যোগের রাত্রি ! তাঁবুর আগুনও তখন নিবুনিবু। তায় বাইরে তো ঘুটঘুটে অন্ধকার। পাতলা কেম্বিসের চটের মাত্র ব্যবধান—তার ওদিকে সাথীহারা পশু। বিরাট গর্জন করতে করতে সেটা একবার তাঁবু থেকে দূরে যায়, আবার কাছে আসে, কখনও তাঁবু প্রদক্ষিণ করে।

ভোর হবার কিছু আগে সিংহটা সরে পড়ল। ওরাও তাঁবু তুলে আবার যাত্রা শুরু করলে ।

ছয়

দিন পনেরো পরে শঙ্কর ও আলভারেজ উজিজি বন্দর থেকে স্টীমারে টাঙ্গানিয়াকা হ্রদের বক্ষে ভাসল। হ্রদ পার হয়ে আলবার্টভিল্ বলে একটা ছোট শহরে কিছু আবশ্যকীয় জিনিস কিনে নিল। এই শহর থেকে কাবালো পর্যন্ত বেলজিয়াম গবর্নমেন্টের রেলপথ আছে। সেখান থেকে কঙ্গো নদীতে স্টীমারে চড়ে তিনদিনের পথ সান্কিনি যেতে হবে, সান্কিনি নেমে কঙ্গোনদীর পথ ছেড়ে, দক্ষিণ মুখে অজ্ঞাত বনজঙ্গল ও মরুভূমির দেশে প্রবেশ করতে হবে।

কাবালো অতি অপরিষ্কার স্থান, কতকগুলো বর্ণসঙ্কর পর্তুগিজ ও বেলজিয়ানের আড্ডা।

স্টেশনের বাইরে পা দিয়েছে এমন সময় একজন পর্তুগিজ ওর কাছে এসে বললে—হ্যালো, কোথায় যাবে ? দেখছি নতুন লোক, আমায় চেন না নিশ্চয়ই। আমার নাম আলবুকার্ক।

শঙ্কর চেয়ে দেখলে আল্ভারেজ তখনও স্টেশনের মধ্যে।

লোকটার চেহারা যেমন কর্কশ, তেমনি কদাকার। কিন্তু সে ভীষণ জোয়ান, প্রায় সাত ফুটের কাছাকাছি লম্বা, শরীরের প্রত্যেকটি মাংসপেশী গুনে নেওয়া যায়, এমনি সুদৃঢ় ও সুগঠিত।

শঙ্কর বললে—তোমার সঙ্গে পরিচিত হয়ে সুখী হলাম। লোকটা বললে—তুমি দেখছি কালা আদমি, বোধ হয় ইস্ট ইন্ডিজের। আমার সঙ্গে পোকার খেলবে চলো।

শঙ্কর ওর কথা শুনে চটেছিল, বললে—তোমার সঙ্গে পোকার খেলবার আমার আগ্রহ নেই। সঙ্গে সঙ্গে সে এটাও বুঝলে, লোকটা পোকার খেলবার ছলে তাদের সর্বস্ব অপহরণ করতে চায়। পোকার একরকম তাসের জুয়াখেলা—শঙ্কর নাম জানলেও সে খেলা কখনো জীবনে দেখেওনি, নাইরোবিতে সে জানতো বদমাইশ জুয়াড়ীরা পোকার খেলার ছল করে নতুন লোকের সর্বনাশ করে। এটা এক ধরনের ডাকাতি।

শঙ্করের উত্তর শুনে পর্তুগিজ বদমাইশটা রেগে লাল হয়ে উঠল। তার চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে বেরুতে চাইল। সে আরও কাছে ঘেঁষে এসে, দাঁতে দাঁত চেপে, অতি বিকৃত সুরে বললে—কি ? নিগার, কি বললি ? ইস্ট ইন্ডিজের তুলনায় তুই অত্যন্ত ফাজিল দেখছি। তোর ভবিষ্যতের মঙ্গলের জন্যে তোক জানিয়ে দিই যে, তোর মত কালা আদমিকে আলবুকার্ক এই রিভলভারের গুলিতে কাদাখোঁচা পাখীর মত ডজনে ডজনে মেরেছে। আমার নিয়ম হচ্ছে এই শোন। কাবালোতে যারা নতুন লোক নামবে, তারা হয় আমার সঙ্গে পোকার খেলবে, নয়তো আমার সঙ্গে রিভলভারে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করবে।

শঙ্কর দেখলে এই বদমাইশ লোকটার সঙ্গে রিভলভারের লড়াইয়ে নামলে মৃত্যু অনিবার্য। বদমাইশটা হচ্ছে একজন ক্যাক্-শট গুন্ডা, আর সে কি ? কাল পর্যন্ত রেলের নিরীহ কেরানী ছিল। কিন্তু যুদ্ধ না করে যদি পোকারই খেলে তবে সর্বস্ব যাবে।

হয়তো আধমিনিট কাল শঙ্করের দেরী হয়েছে উত্তর দিতে, লোকটা কোমরের চামড়ার হোলস্টার থেকে নিমেষের মধ্যে রিভলভার বার করে শঙ্করের পেটের কাছে উঁচিয়ে বললে--যুদ্ধ না পোকার ?

শঙ্করের মাথায় রক্ত উঠে গেল। ভীরুর মত সে পাশবিক শক্তির কাছে মাথা নীচু করবে না, হোক মৃত্যু।

সে বলতে যাচ্ছে—যুদ্ধ, এমন সময় পেছন থেকে ভয়ানক বাজখাই সুরে কে বললে—এই ! সামলাও, গুলিতে মাথার চাঁদি উড়ল! দুজনেই চমকে উঠে পেছনে চাইলে। আল্ভারেজ তার উইনচেস্টার রিপিটারটা বাগিয়ে উঁচিয়ে পর্তুগিজ বদমাইশটার মাথা লক্ষ্য করে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে। শঙ্কর সুযোগ বুঝে চট করে পিস্তলের নলের উল্টোদিকে ঘুরে গেল। আলভারেজ বললে—বালকের সঙ্গে রিভলভার ডুয়েল ? ছোঃ, তিন বলতে পিস্তল ফেলে দিবি—এক-দুই-তিন-

আলবুকার্কের শিথিল হাত থেকে পিস্তলটা মাটিতে পড়ে গেল।

আল্ভারেজ, বললে— বালককে একা পেয়ে খুব বীরত্ব জাহির করছিলি, না ?

শঙ্কর ততক্ষণ পিস্তলটা মাটি থেকে কুড়িয়ে নিয়েছে। আলবুকার্ক একটু বিস্মিত হল, আলভারেজ যে শঙ্করের দলের লোক, তা সে ভাবেওনি। সে হেসে বললে—আচ্ছা মেট, কিছু মনে কোরো না, আমারই হার। দাও, আমার পিস্তলটা দাও ছোকরা। কোনো ভয় নেই, দাও। এসো, হাতে হাত দাও। তুমিও মেট। আলবুকার্ক রাগ পুষে রাখে না। এসো, কাছেই আমার কেবিন, এক এক গ্লাস বিয়ার খেয়ে যাও।

আল্ভারেজ নিজের জাতের লোকের রক্ত চেনে। ও নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে শঙ্করকে সঙ্গে নিয়ে আলবুকার্কের কেবিনে নিয়ে গেল। শঙ্কর বিয়ার খায় না শুনে তাকে কফি করে দিলে। প্রাণখোলা হাসি হেসে কত গল্প করলে, যেন কিছুই হয়নি।

শঙ্কর বাস্তবিকই লোকটার দিকে আকৃষ্ট হল। কিছুক্ষণ আগের অপমান ও শত্রুতা যে এখন বেমালুম ভুলে গিয়ে, যাদের হাতে অপমান হয়েছে, তাদেরই সঙ্গে এমনিধারা দিলখোলা হেসে খোশগল্প করতে পারে, পৃথিবীতে সে ধরনের লোক বেশী নেই।

পরদিন ওরা কাবালো থেকে স্টীমারে উঠল কঙ্গোনদী বেয়ে দক্ষিণ মুখে যাবার জন্যে। নদীর দুই তীরের দৃশ্যে শঙ্করের মন আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল।

এরকম অদ্ভুত বনজঙ্গলের দৃশ্য জীবনে কখনো সে দেখেনি। এতদিন সে যেখানে ছিল, আফ্রিকার সে অঞ্চলে এমন বন নেই—সে শুধু বিস্তীর্ণ প্রান্তর, প্রধানতঃ ঘাসের বন, মাঝে মাঝে বাবলা ও ইউকা গাছ। কিন্তু কঙ্গোনদী বেয়ে স্টীমার যত অগ্রসর হয়, দুধারে নিবিড় বনানী, কত ধরনের মোটা মোটা লতা, বনের ফুল ; বন্যপ্রকৃতি এখানে আত্মহারা, লীলাময়ী, আপনার সৌন্দর্যে ও নিবিড় প্রাচুর্যে আপনি মুগ্ধ।

শঙ্করের মধ্যে যে সৌন্দর্যপ্রিয় ভাবুক মনটি ছিল, (হাজার হোক সে বাংলার মাটির ছেলে, ডিয়েগো আল্‌ভারেজের মত শুধু কঠিন-প্রাণ স্বর্ণান্বেষী প্রসপেক্টর নয়) এই রূপের মেলায় সে মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়ে রাঙা অপরাহ্ণে ও দুপুর রোদে আপন মনে কত কি স্বপ্নজাল রচনা করে।

অনেক রাত্রে সবাই ঘুমিয়ে পড়ে, অচেনা তারাভরা বিদেশের আকাশের তলায় রহস্যময়ী বন্য প্রকৃতি তখন যেন জেগে উঠেছে—জঙ্গলের দিক থেকে কত বন্যজন্তুর ডাক কানে আসে, শঙ্করের চোখে ঘুম নেই ; এই সৌন্দর্য-স্বপ্নে বিভোর হয়ে মধ্য আফ্রিকার নৈশ শীতলতাকে তুচ্ছ করেও জেগে বসে থাকে।

ঐ জ্বলজ্বলে সপ্তর্ষিমণ্ডল—আকাশে অনেক দূরে তার ছোট্ট গ্রামের মাথায়ও আজ এমনি সপ্তর্ষিমণ্ডল উঠেছে, ওই রকম এক ফালি কৃষ্ণপক্ষের গভীর রাত্রির চাঁদও। সে-সব পরিচিত আকাশ ছেড়ে কতদূরে সে এসে পড়েছে, আরও কতদূরে তাকে যেতে হবে, কি এর পরিণতি কে জানে ?

দু'দিন পরে বোট এসে সান্কিনি পৌঁছুলো। সেখান থেকে ওরা আবার পদব্রজে রওনা হল—জঙ্গল এদিকে বেশী নেই, কিন্তু দিগন্তপ্রসারী জনমানবহীন প্রান্তর ও অসংখ্য ছোট বড় পাহাড়, অধিকাংশ পাহাড় রুক্ষ ও বৃক্ষশূন্য, কোনো কোনো পাহাড়ে ইউফোর্বিয়া জাতীয় গাছের ঝোপ। কিন্তু শঙ্করের মনে হল, আফ্রিকার এই অঞ্চলের দৃশ্য বড় অপরূপ। এতটা ফাঁকা জায়গা পেয়ে মন যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে, সূর্যাস্তের রঙ, জ্যোৎস্নারাত্রির মায়া, এই দেশকে রাত্রে, অপরাহ্ণ রূপকথার পরীরাজ্য করে তোলে।

আল্‌ভারেজ বললে—এই ভেল্ড্ অঞ্চলে সব জায়গা দেখতে একরকম বলে পথ হারাবার সম্ভাবনা কিন্তু খুব বেশী।

কথাটা যেদিন বলা হল, সেদিনই এক কাণ্ড ঘটল। জনহীন ভেল্ডে সূর্য অস্ত গেলে ওরা একটা ছোট পাহাড়ের আড়ালে তাঁবু খাটিয়ে আগুন জ্বাললে—শঙ্কর জল খুঁজতে বেরুল। সঙ্গে আল্‌ভারেজের বন্দুকটা নিয়ে গেল, কিন্তু মাত্র দুটি টোটা। আধঘণ্টা এদিক ওদিক ঘুরে বেলাটুকু গেল, পাতলা অন্ধকারে সমস্ত প্রান্তরকে ধীরে ধীরে আবৃত করে দিলে । শঙ্কর শপথ করে বলতে পারে, সে আধঘণ্টার বেশী হাঁটেনি। হঠাৎ চারিধারে চেয়ে শঙ্করের ' কেমন একটা অস্বস্তি বোধ হল, যেন কি একটা বিপদ আসছে, তাঁবুতে ফেরা ভালো। দূরে দূরে ছোট বড় পাহাড়, একই রকম দেখতে সব দিক, কোনো চিহ্ন নেই, সব একাকার।

মিনিট পাঁচ-ছয় হাঁটবার পরই শঙ্করের মনে হল সে পথ হারিয়েছে। তখন আলভারেজের কথাটা তার মনে পড়ল। কিন্তু তখনও সে অনভিজ্ঞতার দরুন বিপদের গুরুত্ব বুঝতে পারলে না। হেঁটেই যাচ্ছে—একবার মনে হয় সামনে, একবার মনে হয় বাঁয়ে, একবার মনে হয় ডাইনে। তাঁবুর আগুনের কুণ্ডটা দেখা যায় না কেন ? কোথায় সেই ছোট পাহাড়টা ?

দু-ঘণ্টা হাঁটবার পরে শঙ্করের খুব ভয় হল। ততক্ষণে সে বুঝেছে যে, সে সম্পূর্ণরূপে পথ হারিয়েছে এবং ভয়ানক বিপদগ্রস্ত। একা তাকে রোডেসিয়ার এই জনমানবশূন্য সিংহসঙ্কুল অজানা প্রান্তরে রাত কাটাতে হবে, অনাহারে এবং এই কনকনে শীতে বিনা কম্বলে ও বিনা আগুনে। সঙ্গে একটা দেশলাই পর্যন্ত নেই।

ব্যাপারটা সংক্ষেপে এই দাড়ালো যে, পরদিন সন্ধ্যার পূর্বে অর্থাৎ পথ হারানোর চব্বিশ ঘণ্টা পরে উদ্ভ্রান্ত, তৃষ্ণায় মুমূর্ষ শঙ্করকে, ওদের তাঁবু থেকে প্রায় সাত মাইল দূরে, একটা ইউফোর্বিয়া গাছের তলা থেকে আল্‌ভারেজ উদ্ধার করে তাঁবুতে নিয়ে এল।

আল্‌ভারেজ বললে—তুমি যে পথ ধরেছিলে শঙ্কর, তোমাকে আজ খুঁজে বার করতে না পারলে, তুমি গভীর থেকে গভীরতর মরুপ্রান্তরের মধ্যে গিয়ে পড়ে, কাল দুপুর নাগাদ তৃষ্ণায় প্রাণ হারাতে। এর আগে তোমার মত অনেকেই রোডেসিয়ার ভেল্ডে এ ভাবে মারা গিয়েছে। এ-সব ভয়ানক জায়গা। তুমি আর কখনও তাঁবু থেকে ওরকম বেরিও না, কারণ তুমি আনাড়ী। মরুভূমিতে ভ্রমণের কৌশল তোমার জানা নেই। ডাহা মারা পড়বে।

শঙ্কর বললে—আল্‌ভারেজ, তুমি দুবার আমার প্রাণ রক্ষা করলে, এ আমি ভুলবো না।

আল্‌ভারেজ বললে—ইয়্যাং ম্যান, ভুলে যাচ্ছ যে তার আগে তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ। তুমি না থাকলে ইউগান্তর তৃণভূমিতে আমার হাড়গুলো সাদা হয়ে আসতো এতদিন।

মাস দুই ধরে রোডেসিয়া ও এঙ্গোলার মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ ভেল্ড অতিক্রম করে, অবশেষে দূরে মেঘের মত পর্বতশ্রেণী দেখা গেল। আল্‌ভারেজ ম্যাপ মিলিয়ে বলল—ওই হচ্ছে আমাদের গন্তব্যস্থান, রিখ্‌টারস্‌ভেল্ড পর্বত,

এখনও এখান থেকে চল্লিশ মাইল হবে। আফ্রিকার এই সব খোলা জায়গায় অনেক দূর থেকে জিনিস দেখা যায়।

এ অঞ্চলে অনেক বাওবাব্ গাছ। শঙ্করের এ গাছটা বড় ভাল লাগে—দূর থেকে যেন মনে হয় বট কি অশ্বত্থ গাছের মত, কিন্তু কাছে গেলে দেখা যায়, বাওবাব্ গাছ ছায়াবিরল অথচ বিশাল, আঁকা-বাঁকা, সারা গায়ে যেন বড় বড় আঁচিল কি আব্ বেরিয়েছে, যেন আরব্য উপন্যাসের একটা বেঁটে, কুদর্শন, কুব্জ দৈত্য। বিস্তীর্ণ প্রান্তরে এখানে ওখানে প্রায় সর্বত্রই দূরে নিকটে বড় বড় বাওবাব্ গাছ দাঁড়িয়ে।

একদিন সন্ধ্যাবেলার দুর্জয় শীতে তাঁবুর সামনে আগুন করে বসে আল্ভারেজ বললে—এই যে দেখছ রোডেসিয়ার ভেল্ড অঞ্চল, এখানে হীরে ছড়ানো আছে, সর্বত্র, এটা হীরের খনির দেশ। কিম্বার্লি খনির নাম নিশ্চয়ই শুনেছ। আরও অনেক ছোটখাটো খনি আছে, এখানে ওখানে ছোট বড় হীরের টুকরো কত লোক পেয়েছে, এখনও পায়।

কথা শেষ করেই বলে উঠল—ও, কারা?

শঙ্কর সামনে বসে ওর কথা শুনছিল। বললে, কোথায় কে ?

কিন্তু আলভারেজের তীক্ষ্ণদৃষ্টি তার হাতের বন্দুকের গুলির মতই অব্যর্থ, একটু পরে তাঁবু থেকে দূরে অন্ধকারে কয়েকটি অস্পষ্ট মূর্তি এদিকে এগিয়ে আসছে, শঙ্করের চোখে পড়ল। আল্ভারেজ বললে—শঙ্কর, বন্দুক নিয়ে এসো, চট করে যাও, টোটা ভরে—

বন্দুক হাতে শঙ্কর বাইরে এসে দেখলে, আল্ভারেজ নিশ্চিন্ত মনে ধূমপান করছে, কিছুদূরে অজানা মূর্তি কয়টি এখনও অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে আসছে। একটু পরে তারা এসে তাঁবুর অগ্নিকুণ্ডের বাইরে দাঁড়ালো। শঙ্কর চেয়ে দেখলে আগন্তুক কয়েকটি কৃষ্ণবর্ণ, দীর্ঘকায়,তাদের হাতে কিছু নেই, পরনে লেংটি, গলায় সিংহের লোম, মাথায় পালক—সুগঠিত চেহারা, তাঁবুর আলোয় মনে হচ্ছিল, যেন কয়েকটি ব্রোঞ্জের মূর্তি।

আল্ভারেজ জুলু ভাষায় বললে—কি চাও তোমরা ?

ওদের মধ্যে কি কথাবার্তা চলল, তার পরে ওরা সব মাটির ওপর বসে পড়ল। আল্ভারেজ বললে-শঙ্কর, ওদের খেতে দাও-

তার পরে অনুচ্চ স্বরে বললে বড় বিপদ। খুব হুঁশিয়ার, শঙ্কর !

টিনের খাবার খোলা হল। সকলের সামনেই খাবার রাখলে শঙ্কর। আল্ভারেজও ওই সঙ্গে আবার খেতে বসলো, যদিও সে ও শঙ্কর সন্ধ্যার সময়েই তাদের নৈশ আহার শেষ করেছে। শঙ্কর বুঝলে আল্ভারেজের কোনো মতলব আছে, কিংবা এদেশের রীতি অতিথির সঙ্গে খেতে হয়।

আল্ভারেজ খেতে খেতে জুলু ভাষায় আগন্তুকদের সঙ্গে গল্প করছে, অনেকক্ষণ পরে খাওয়া শেষ করে ওরা চলে গেল। চলে যাবার আগে সবাইকে একটা করে সিগারেট দেওয়া হল।

ওরা চলে গেলে আল্ভারেজ বললে—ওরা মাটাবেল জাতির লোক। ভয়ানক দুর্দান্ত, ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের সঙ্গে অনেকবার লড়েছে। শয়তানকেও ভয় করে না। ওরা সন্দেহ করেছে আমরা ওদের দেশে এসেছি হীরের খনির সন্ধানে। আমরা যে জায়গাটায় আছি, এটা ওদের একজন সর্দারের রাজ্য। কোনো সভ্য গবর্নমেন্টের আইন এখানে খাটবে না। ধরবে আর নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে মারবে। চলো আমরা তাঁবু তুলে রওনা হই।

শঙ্কর বললে—তবে তুমি বন্দুক আনতে বললে কেন?

আল্ভারেজ হেসে বললে—দ্যাখো, ভেবেছিলুম যদি ওরা খেয়েও না ভোলে, কিংবা কথাবার্তায় বুঝতে পারি যে, ওদের মতলব খারাপ, ভোজনরত অবস্থাতেই ওদের গুলি করবো। এই দ্যাখো রিভলভার পেছনে রেখে তবে খেতে বসেছিলাম। এ কটাকে সাবাড় করে দিতাম। আমার নাম আল্ভারেজ, আমিও একসময়ে শয়তানকেও ভয় করতুম না, এখনও করি নে। ওদের হাতের মাছ মুখে পৌঁছোবার আগেই আমার পিস্তলের গুলি ওদের মাথার খুলি উড়িয়ে দিত।

আরও পাঁচ-ছ' দিন পথ চলবার পরে একটা খুব বড় পর্বতের পাদমূলে নিবিড় ট্রপিক্যাল অরণ্যানীর মধ্যে ওরা প্রবেশ করলে। স্থানটি যেমন নির্জন, তেমনি বিশাল। সে বন দেখে শঙ্করের মনে হল, একবার যদি সে এর মধ্যে পথ হারায়, সারাজীবন ঘুরলেও বার হয়ে আসবার সাধ্য তার হবে না। আল্ভারেজও তাকে সাবধান করে দিয়ে বললে—খুব হুঁশিয়ার শঙ্কর, বনে চলাফেরা যার অভ্যাস নেই, সে পদে পদে এই সব বনে পথ হারাবে। অনেক লোক বেঘোরে পড়ে বনের মধ্যে মারা পড়ে। মরুভূমির মধ্যে যেমন পথ হারিয়ে ঘুরেছিলে, এর মধ্যেও ঠিক তেমনিই পথ হারাতে পারো। কারণ এখানে সবই একরকম, এক জায়গা থেকে আর এক জায়গাকে পৃথক করে চিনে নেবার কোনো চিহ্ন নেই। ভাল বুশম্যান না হলে পদে পদে বিপদে পড়তে হবে। বন্দুক না নিয়ে এক পা কোথাও যাবে না, এটিও যেন মনে থাকে। মধ্য আফ্রিকার বন শৌখিন ভ্রমণের পার্ক নয়।

শঙ্করকে তা না বললেও চলতো, কারণ এসব অঞ্চল যে শখের পার্ক নয়, তা এর চেহারা দেখেই সে বুঝতে পেরেছে। সে জিজ্ঞেস করলে—তোমার সেই হলদে হীরের খনি কতদূরে ? এই তো রিখ্‌টারসভেল্ড পর্বতমালা, ম্যাপে যতদূর বোঝা যাচ্ছে।

আল্‌ভারেজ হেসে বললে—তোমার ধারণা নেই বললাম যে। আসল রিখটারসভেল্ডের এটা বাইরের থাক। এ রকম আরও অনেক থাক আছে। সমস্ত অঞ্চলটা এত বিশাল যে পূবে সত্তর মাইল ও পশ্চিম দিকে একশো থেকে দেড়শো মাইল পর্যন্ত গেলেও এ বন ও পাহাড় শেষ হবে না। সর্বনিম্ন প্রস্থ চল্লিশ মাইল। সমস্ত জড়িয়ে আট ন' হাজার বর্গমাইল সমস্ত রিখটারস্ভেল্ড পার্বত্য অঞ্চল ও অরণ্য। এই বিশাল অজানা অঞ্চলের কোনখানটাতে এসেছিলুম আজ সাত আট বছর আগে, ঠিক সে জায়গাটা খুঁজে বার করা কি ছেলেখেলা, ইয়াং ম্যান ?

শঙ্কর বললে—এদিকে খাবার ফুরিয়েছে, শিকারের ব্যবস্থা দেখতে হয়, নইলে কাল থেকে বায়ুভক্ষণ ছাড়া উপায় নেই।। আলভারেজ বললে কিছু ভেবো না।' দেখছো না গাছে গাছে বেবুনের মেলা ? কিছু না মেলে বেবুনের দাপনা ভাজা আর কফি দিয়ে দিব্যি ব্রেকফাস্ট খাবো কাল থেকে। আজ আর নয়, তাঁবু ফেল, বিশ্রাম করা যাক।

একটা বড় গাছের নীচে তাঁবু খাটিয়ে ওরা আগুন জ্বাললে। শঙ্কর রান্না করলে, আহারাদি শেষ করে যখন দুজনে আগুনের সামনে বসেছে, তখনও বেলা আছে।

আল্‌ভারেজ কড়া তামাকের পাইপ টানতে টানতে বললে—জানো শঙ্কর, আফ্রিকার এই সব অজানা অরণ্যে এখনও কত জানোয়ার আছে, যার খবর বিজ্ঞানশাস্ত্র রাখে না। খুব কম সভ্য মানুষ এখানে এসেছে। ওকাপি বলে যে জানোয়ার সে তো প্রথম দেখা গেল ১৯০০ সালে। এক ধরনের বুনো শূওর আছে, যা সাধারণ বুনো শূওরের প্রায় তিনগুণ বড় আকারের। ১৮৮৮ সালে মোজেস্ কাউলে, পৃথিবী-পর্যটক ও বড় শিকারী, সর্বপ্রথম ওই বুনো শূওরের সন্ধান পান বেলজিয়ান কঙ্গোর লুয়ালাবু অরণ্যের মধ্যে। তিনি বহু কষ্টে একটা শিকার করেন এবং নিউইয়র্ক প্রাণীবিদ্যা সংক্রান্ত মিউজিয়মে উপহার দেন। বিখ্যাত রোডেসিয়ান মন্‌স্টারের নাম শুনেছ ?

শঙ্কর বললে—না, কি সেটা?

—শোনো তবে। রোডেসিয়ার উত্তর সীমায় প্রকাণ্ড জলাভূমি আছে। ওদেশের অসভ্য জুলুদের মধ্যে অনেকেই এক অদ্ভুত ধরনের জানোয়ারকে এই জলাভূমিতে মাঝে মাঝে দেখেছে। ওরা বলে তার মাথা কুমীরের মত, গণ্ডারের মত তার সিং আছে, গলাটা অজগর সাপের মত লম্বা ও আঁশওয়ালা দেহটা জলহস্তীর মত, লেজটা কুমীরের মত। বিরাটদেহ এই জানোয়ারের প্রকৃতিও খুব হিংস্র। জল ছাড়া কখনো ডাঙায় এ জানোয়ারকে দেখা যায়নি। তবে এই সব অসভ্য দেশী লোকের অতিরঞ্জিত বিবরণ বিশ্বাস করা শক্ত।

কিন্তু ১৮৮০ সালে জেম্‌স মার্টিন বলে একজন প্রসপেক্টর রোডেসিয়ার এই অঞ্চলে বহুদিন ঘুরেছিলেন সোনার সন্ধানে। মিঃ মাটিন আগে জেনারেল ম্যাথিউসের এডিকং ছিলেন, নিজে একজন ভালো ভূতত্ত্ব ও প্রাণীতত্ত্ববিদও ছিলেন। ইনি তাঁর ডায়েরীর মধ্যে রোডেসিয়ার এই অজ্ঞাত জানোয়ার দূর থেকে দেখেছেন বলে উল্লেখ করে গিয়েছেন। তিনি বলেন, জানোয়ারটা আকৃতিতে প্রাগৈতিহাসিক যুগের ডাইনোসর জাতীয় সরীসৃপের মত ও বেজায় বড়। কিন্তু তিনি জোর করে কিছু বলতে পারেননি, কারণ খুব ভোরের কুয়াশার মধ্যে কোভিরান্ডো হ্রদের সীমানায় জলাভূমিতে আবছায়া ভাবে তিনি জানোয়ারটাকে দেখেছিলেন। জানোয়ারটার ঘোড়ার চিঁহিঁ ডাকের মত ডাক শুনেই তাঁর সঙ্গে জুলু চাকরগুলো ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাতে পালাতে বললে–সাহেব পালাও, পালাও, ডিঙ্গোনেক্ ! ডিঙ্গোনেক্ ! ডিঙ্গোনেক্ ঐ জানোয়ারটার জুলু নাম। দু-তিন বছরে এক আধবার দেখা দেয় কি না দেয়, কিন্তু সেটা এতই হিংস্র যে তার আবির্ভাব সে দেশের লোকের পক্ষে ভীষণ ভয়ের ব্যাপার। মিঃ মার্টিন বলেন, তিনি তার • ৩০৩ টোটা গোটা দুই উপরি উপরি ছুঁড়েছিলেন জানোয়ারটার দিকে। অতদূর থেকে তাক হল না, রাইফেলের আওয়াজে সেটা সম্ভবতঃ জলে ডুব দিলে।।

শঙ্কর বললে—তুমি কি করে জানলে এসব ? মিঃ মার্টিনের ডায়েরী ছাপানো হয়েছিল নাকি ?

—না, অনেকদিন আগে বুলাওয়েও ক্রনিকল কাগজে মিঃ মার্টিনের এই ঘটনাটা বেরিয়েছিল। আমি তখন সবে এদেশে এসেছি। রোডেসিয়া অঞ্চলে আমিও প্রস্‌পেক্‌টিং করে বেড়াতুম বলে জানোয়ারটার বিবরণ আমাকে খুব আকৃষ্ট করে। কাগজখানা অনেকদিন আমার কাছে রেখেও দিয়েছিলুম। তার পর কোথায় হারিয়ে গেল। ওরাই নাম দিয়েছিল জানোয়ারটার রোডেসিয়ান মস্টার।

শঙ্কর বললে, তুমি কোনো কিছু অদ্ভুত জানোয়ার দ্যাখোনি ?

প্রশ্নটার সঙ্গে সঙ্গে একটা আশ্চর্য ব্যাপার ঘটল।

তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হয়ে নেমে এসেছে। সেই আবছায়া আলো-অন্ধকারের মধ্যে শঙ্করের মনে হল—হয়তো শঙ্করের ভুল হতে পারে—কিন্তু শঙ্করের মনে হয় সে দেখলে আল্‌ভারেজ দুর্ধর্ষ ও নির্ভীক আল্‌ভারেজ,

দুদে ও অব্যর্থ-লক্ষ্য আল্‌ভারেজ ওর প্রশ্ন শুনে চমকে উঠলো—এবং—এবং সেইটাই সকলের চেয়ে আশ্চর্য—যেন পরক্ষণেই শিউরে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে আল্‌ভারেজ যেন নিজের অজ্ঞাতসারেই চারিপাশের জনমানবহীন ঘন জঙ্গল ও রহস্যভরা দুরারোহ পর্বতমালার দিকে একবার চেয়ে দেখলে, কোন কথা বললে না। যেন এই পর্বতজঙ্গলে বহুকাল পরে এসে অতীতের কোনো বিভীষিকাময়ী পুরাতন ঘটনা ওর স্মৃতিতে ভেসে উঠেছে, যে স্মৃতিটা ওর পক্ষে খুব প্রীতিকর নয়।

আল্‌ভারেজ ভয় পেয়েছে !

অবাক ! আল্‌ভারেজের ভয় ! শঙ্কর ভাবতেও পারে না। কিন্তু সেই ভয়টা অলক্ষিতে এসে শঙ্করের মনেও চেপে বসলো। এই সম্পূর্ণ অজানা বিচিত্র রহস্যময়ী বনানী, এই বিরাট পর্বতপ্রাচীর যেন এক গভীর রহস্যকে যুগ যুগ ধরে গোপন করে আসছে—যে বীর হও, যে নির্ভীক হও, এগিয়ে এসো সে—কিন্তু মৃত্যুপণে ক্রয় করতে হবে সে গহন রহস্যের সন্ধান। রিখ্‌টারস্‌ভেল্ড পর্বতমালা ভারতবর্ষের দেবতাত্মা নগাধিরাজ হিমালয় নয়—এদেশের মাসাই, জুল, মাটাবেল প্রভৃতি আদিম জাতির মতই ওর আত্মা নিষ্ঠুর, বর্বর, নরমাংসলোলুপ । সে কাউকে রেহাই দেবে না।

সাত

তার পর দিন দুই কেটে গেল। ওরা ক্রমশঃ গভীর থেকে গভীরতর জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করলে। পথ কোথাও সমতল নয়, কেবল চড়াই আর উৎরাই, মাঝে মাঝে কর্কশ ও দীর্ঘ টুসক্ ঘাসের বন, জল প্রায় দুষ্প্রাপ্য, ঝরনা এক-আধটা যদিও বা দেখা যায়, আল্‌ভারেজ তাদের জল ছুঁতেও দেয় না। দিব্যি স্ফটিকের মত নির্মল জল পড়ছে ঝরনা বেয়ে, সুশীতল ও লোভনীয়, তৃষ্ণার্ত লোকের পক্ষে সে লোভ সম্বরণ করা। বড়ই কঠিন—কিন্তু আল্‌ভারেজ জলের বদলে ঠাণ্ডা চা খাওয়াবে তবুও জল খেতে দেবে না। জলের তৃষ্ণা ঠাণ্ডা চায়ে দূর হয় না, তৃষ্ণার কষ্টই সব চেয়ে বেশী কষ্ট বলে মনে হচ্ছিল শঙ্করের। একস্থানে টুসক্ ঘাসের বন বেজায় ঘন। তার ওপরে ওদের চারিধারে ঘিরে সেদিন কুয়াশাও খুব গভীর। হঠাৎ বেলা উঠলে নীচের কুয়াশা সরে গেল—সামনে চেয়ে শঙ্করের মনে হল, খুব বড় একটা চড়াই তাদের পথ আগলে দাঁড়িয়ে, কত উঁচু সেটা তা জানা সম্ভব নয়, কারণ নিবিড় কুয়াশা কিংবা মেঘে তার ওপরের দিকটা সম্পূর্ণরূপে আবৃত। আল্‌ভারেজ বললে—রিখ্‌টারস্‌ভেল্ডের
আসল রেঞ্জ।

শঙ্কর বললে—এটা পার হওয়া কি দরকার ?

আল্‌ভারেজ্ বললে—এইজন্যে দরকার যে সেবার আমি আর জিম দক্ষিণ দিক থেকে এসেছিলুম এই পর্বতশ্রেণীর পাদমূলে, কিন্তু আসল রেঞ্জ পার হইনি। যে নদীর ধারে হল্‌দে হীরে পাওয়া গিয়েছিল, তার গতি পুব থেকে পশ্চিমে। এবার আমরা যাচ্ছি উত্তর থেকে দক্ষিণে। সুতরাং পর্বত পার হয়ে ওপারে না গেলে কি করে সেই নদীটার ঠিকানা করতে পারি ?

শঙ্কর বললে—আজ যেরকম কুয়াশা হয়েছে দেখতে পাচ্ছি, তাতে একটু অপেক্ষা করা যাক না কেন ? আর একটু বেলা বাড়ুক।।

তাঁবু ফেলে আহারাদি সম্পন্ন করা হল। বেলা বাড়লেও কুয়াশা তেমন কাটল না। শঙ্কর ঘুমিয়ে পড়ল তাঁবুর মধ্যে। ঘুম যখন ভাঙল, বেলা তখন নেই। চোখ মুছতে মুছতে তাঁবুর বাইরে এসে সে দেখলে, আল্‌ভারেজ চিন্তিত-মুখে ম্যাপ খুলে বসে আছে। শঙ্করকে দেখে বললে—শঙ্কর, আমাদের এখনও অনেক ভুগতে হবে। সামনে চেয়ে দেখ।

আল্‌ভারেজের কথার সঙ্গে সঙ্গে সামনের দিকে চাইতেই এক গম্ভীর দৃশ্য শঙ্করের চোখে পড়ল। কুয়াশা কখন কেটে গেছে, তার সামনে বিশাল রিখটারস্‌ভেল্ড পর্বতের প্রধান থাক ধাপে ধাপে উঠে, মনে হয় যেন আকাশে গিয়ে ঠেকেছে। পাহাড়ের কটিদেশ নিবিড় বিদ্যুৎগর্ভ মেঘপুঞ্জে আবৃত কিন্তু উচ্চতম শিখররাজি অস্তমান সূর্যের রাঙা আলোয় দেবলোকের কনকদেউলের মত বহুদূর নীলশূন্যে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে।

কিন্তু সামনের পর্বতাংশ সম্পূর্ণ দুরারোহ—শুধুই খাড়া খাড়া উত্তুঙ্গ শৃঙ্গ—কোথাও একটু ঢালু নেই । আল্‌ভারেজ বললে—এখান থেকে পাহাড়ে ওঠা সম্ভব নয়, শঙ্কর। দেখেই বুঝছ নিশ্চয়। পাহাড়ের কোলে কোলে পশ্চিম দিকে চল। যেখানে ঢালু এবং নীচু পাবো, সেখান দিয়েই পাহাড় পার হতে হবে। কিন্তু এই দেড়শো মাইল লম্বা পর্বতশ্রেণীর মধ্যে কোথায় সে-রকম জায়গা আছে, এ খুঁজতেই তো এক মাসের ওপর যাবে দেখছি।

কিন্তু দিন পাঁচ-ছয় পশ্চিম দিকে যাওয়ার পরে এমন একটা জায়গা পাওয়া গেল, যেখানে পর্বতের গা বেশ ঢালু, সেখান দিয়ে পর্বতে ওঠা চলতে পারে ।

পরদিন খুব সকাল থেকে পর্বতারোহণ শুরু হল। শঙ্করের ঘড়িতে তখন বেলা সাড়ে ছ'টা। সাড়ে আটটা বাজতে না বাজতে শঙ্কর আর চলতে পারে না। যে জায়গাটা দিয়ে তারা উঠছে—সেখানে পর্বতের চার মাইলের মধ্যে উঠেছে ছ'হাজার ফুট, সুতরাং পথটা ঢালু হলেও কী ভীষণ দুরারোহ তা সহজেই বোঝা যাবে। তা ছাড়া যতই ওপরে উঠছে অরণ্য ততই নিবিড়তর, ঘন অন্ধকার চারিদিক, বেলা হয়েছে, রোদ উঠেছে, অথচ সূর্যের আলো ঢোকেনি জঙ্গলের মধ্যে—আকাশই চোখে পড়ে না তায় সূর্যের আলো।

পথ বলে কোনো জিনিস নেই। চোখের সামনে শুধুই গাছের গুঁড়ি যেন ধাপে ধাপে আকাশের দিকে উঠে চলেছে। কোথা থেকে জল পড়েছে কে জানে, পায়ের নীচের প্রস্তর আর্দ্র ও পিচ্ছিল, প্রায় সর্বত্রই পাথরের ওপর শেওলা-ধরা। পা পিছলে গেলে গড়িয়ে। নীচের দিকে বহুদূর চলে গিয়ে তীক্ষ্ণ শিলাখণ্ডে আহত হতে হবে।

শঙ্কর বা আল্‌ভারেজ্‌ কারো মুখে কথা নেই। এই উত্তুঙ্গ পথে ওঠবার কষ্টে দুজনেই অবসন্ন, দুজনেরই ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছে। শঙ্করের কষ্ট আরও বেশী, বাংলা সমতলভূমিতে আজন্ম মানুষ হয়েছে, পাহাড়ে ওঠার অভ্যাসই নেই কখনো।

শঙ্কর ভাবছে, আল্‌ভারেজ কখন বিশ্রাম করতে বলবে? সে আর উঠতে পারছে না, কিন্তু যদি সে মরেও যায়, একথা আলভারেজকে সে কখনই বলবে না যে, সে আর পারছে না। হয়তো তাতে আলভারেজ ভাববে, ইস্ট ইন্ডিজের মানুষগুলো দেখছি নিতান্ত অপদার্থ। এই মহাদুর্গম পর্বত ও অরণ্যে সে ভারতের প্রতিনিধি—এমন কোনো কাজ সে করতে পারে না যাতে তার মাতৃভূমির মুখ ছোট হয়ে যায়।

বড় চমৎকার বন, যেন পরীর রাজ্য, মাঝে মাঝে ছোটখাটো ঝরনা বনের মধ্যে দিয়ে খুব ওপর থেকে নীচে নেমে যাচ্ছে। গাছের ডালে ডালে নানা রঙের টিয়াপাখী চোখ ঝলসে দিয়ে উড়ে বেড়াচ্চে। বড় বড় ঘাসের মাথায় সাদা সাদা ফুল, অর্কিডের ফুল ঝুলছে গাছের ডালের গায়ে, খুঁড়ির গায়ে।

হঠাৎ শঙ্করের চোখ পড়ল, গাছের ডালে মাঝে মাঝে লম্বা দাড়ি-গোঁফওয়ালা বালখিল্য মুনিদের মত ও কারা বসে রয়েছে ! তারা সবাই চুপচাপ বসে, মুনিজনোচিত গাম্ভীর্যে ভরা। ব্যাপার কি ?

আল্‌ভারেজ বললে ও কলোবাস্‌ জাতীয় মাদী বানর। পুরুষ জাতীয় কলোবাস্‌ বানরের দাড়ি-গোঁফ নেই, স্ত্রী জাতির কলোবাস্‌ বানরের হাতখানেক লম্বা দাড়ি-গোঁফ গজায় এবং তারা বড় গম্ভীর, দেখেই বুঝতে পাচ্ছ।

ওদের কাণ্ড দেখে শঙ্কর হেসেই খুন।

পায়ের তলায় মাটিও নেই, পাথরও নেই—তাদের বদলে আছে শুধু পচা পাতা ও শুকনো গাছের গুঁড়ির স্তূপ। এই সব বনে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পাতার রাশি ঝরছে, পচে যাচ্ছে, তার ওপরে শেওলা পুরু হয়ে উঠছে, ছাতা গজাচ্ছে, তার ওপরে আবার নতুন-ঝরা পাতার রাশি, আবার পড়ছে গাছের ডাল-পালা, গুঁড়ি। জায়গায় জায়গায় ষাট-সত্তর ফুট গভীর হয়ে জমে রয়েছে এই পত্রস্তূপ।

আল্‌ভারেজ্‌ ওকে শিখিয়ে দিলে, এসব জায়গায় খুব সাবধানে পা ফেলে চলতে হবে। এমন জায়গা আছে, যেখানে মানুষে চলতে চলতে ওই ঝরা পাতার রাশির মধ্যে ভুস্‌ করে ঢুকে ডুবে যেতে পারে, যেমন অতর্কিতে পথ চলতে চলতে প্রাচীন কূপের মধ্যে পড়ে যায় । উদ্ধার করা সম্ভব না হলে সে-সব ক্ষেত্রে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে মৃত্যু অনিবার্য।

শঙ্কর বললে—পথের গাছপালা না কাটলে আর তো ওঠা যাচ্ছে না,বড় ঘন হয়ে উঠছে।

ক্ষুরের মত ধারালো চওড়া এলিফ্যান্ট ঘাসের বন—যেন রোমান যুগের দ্বি-ধার তলোয়ার । তার মধ্যে দিয়ে যাবার সময় দুজনের কেউই নিরাপদ বলে ভাবছে না নিজেকে, দু-হাত তফাতে কি আছে দেখা যায় না যখন, তখন সব রকম বিপদের সম্ভাবনাই তো রয়েছে। থাকতে পারে বাঘ, থাকতে পারে সিংহ, থাকতে পারে বিষাক্ত সাপ।

শঙ্কর লক্ষ্য করছে মাঝে মাঝে ডুগডুগি বা ঢোল বাজনার মত একটা শব্দ হচ্ছে কোথায় যেন বনের মধ্যে। কোনো অসভ্য জাতির লোক ঢোল বাজাচ্ছে নাকি ? আলভারেজকে সে জিজ্ঞেস করলে।

আল্‌ভারেজ বললে—ঢোল নয়, বড় বেবুন কিংবা বনমানুষে বুক চাপড়ে ওই রকম শব্দ করে। মানুষ এখানে কোথা থেকে আসবে ? '

শঙ্কর বললে—তুমি যে বলেছিলে এ বনে গরিলা নেই? —গরিলা সম্ভবতঃ নেই। আফ্রিকার মধ্যে বেলজিয়ান কঙ্গোর কিভু অঞ্চল, রাওয়েনজরী আল্পস বা ভিরুঙ্গা আগ্নেয় পর্বতের অরণ্য ছাড়া কোথাও গরিলা আছে বলে তো জানা নেই। গরিলা ছাড়াও অন্য ধরনের বনমানুষে বুক চাপড়ে ওই রকম আওয়াজ করতে পারে।

ওরা সাড়ে চার হাজার ফুটের ওপর উঠেছে। সেদিনের মত সেখানেই রাত্রির বিশ্রামের জন্য তাঁবু ফেলা হল। একটা বিশাল সত্যিকার ট্রপিক্যাল অরণ্যের রাত্রিকালীন শব্দ এত বিচিত্র ধরনের ও এত ভীতিজনক যে সারারাত শঙ্কর চোখের পাতা বোজাতে পারলে না। শুধু ভয় নয়, ভয়মিশ্রিত একটা বিস্ময়।

কত রকমের শব্দ—হায়েনার হাসি, কলোবাস্‌ বানরের কর্কশ চীৎকার, বনমানুষের বুক চাপড়ানোর আওয়াজ, বাঘের ডাক—প্রকৃতির এই বিরাট নিজস্ব পশুশালায় রাত্রে কেউ ঘুমোয় না।

সমস্ত অরণ্যটা এই গভীর রাত্রে যেন হঠাৎ ক্ষেপে উঠেছে। বছর কয়েক আগে খুব বড় একটা সার্কাসের দল এসে ওদের স্কুল-বোর্ডিংয়ের পাশের মাঠে তাঁবু ফেলেছিল, তাদের জানোয়ারদের চীৎকারে বোর্ডিংয়ের ছেলেরা রাত্রে ঘুমুতে পারতো না—শঙ্করের সেই কথা এখন মনে পড়ল। কিন্তু এসবের চেয়েও মধ্যরাত্রে একদল বন্য হস্তীর বৃংহিত ধ্বনি তাঁবুর অত্যন্ত নিকটে শুনে শঙ্কর এমন ভয় পেয়ে গেল যে, আলভারেজকে তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে ওঠালে। আল্‌ভারেজ্‌ বললে—আগুন জ্বলছে তাঁবুর বাইরে, কোনো ভয় নেই, ওরা ঘেঁষবে না এদিকে।

সকালে উঠে আবার ওপরে ওঠা শুরু। উঠছে, উঠছে—মাইলের পর মাইল বন্য বাঁশের অরণ্য, তার তলায় বুনো আদা। ওদের পথের একশো হাতের মধ্যে বাঁ দিকের বাঁশবনের তলা দিয়ে একটা প্রকাণ্ড হস্তীযূথ কচি বাঁশের কোঁড় মড় মড় করে ভাঙতে ভাঙতে চলে গেল ।

পাঁচ হাজার ফুট ওপরে কত কি বন্য পুষ্পের মেলা—টক্‌টকে লাল ইরিথ্রিনা প্রকাণ্ড গাছে ফুটেছে। পুষ্পিত ইপোমিয়া লতার ফুল দেখতে ঠিক বাংলাদেশের বনকলমী ফুলের মত কিন্তু রঙটা অত গাঢ় বেগুনি নয়। সাদা ভেরোনিকা ঘন সুগন্ধে বাতাসকে ভারাক্রান্ত করেছে। বন্য কফির ফুল, রঙীন বেগোনিয়া। মেঘের রাজ্যে ফুলের বন, মাঝে মাঝে সাদা বেলুনের মত মেঘপুঞ্জ গাছপালার মগডালে এসে আটকাচ্ছে—কখনও বা আরও নেমে এসে ভেরোনিকার বন ভিজিয়ে দিয়ে যাচ্ছে।

সাড়ে সাত হাজার ফুটের ওপর থেকে বনের প্রকৃতি একেবারে বদলে গেল। এই পর্যন্ত উঠতে ওদের আরও দু'দিন লেগেছে। আর অসহ্য কষ্ট, কোমর পিঠ ভেঙে পড়ছে। এখানে বনানীর মূর্তি বড় অদ্ভুত, প্রত্যেক গাছের গুঁড়ি ও শাখাপ্রশাখা পুরু শেওলায় আবৃত, প্রত্যেক ডাল থেকে শেওলা ঝুলছে—সে শেওলা কোথাও কোথাও এত লম্বা যে, গাছ থেকে ঝুলে প্রায় মাটিতে এসে ঠেকবার মত হয়েছে—বাতাসে সেগুলো আবার দোল খাচ্ছে, তার ওপর কোথাও সূর্যের আলো নেই, সব সময়ই যেন গোধূলি। আর সবটা ঘিরে বিরাজ করছে এক অপার্থিব ধরনের নিস্তব্ধতা—বাতাস বইছে তারও শব্দ নেই, পাখীর কূজন নেই সে বনে—মানুষের গলার সুর নেই, কোনো জানোয়ারের ডাক নেই। যেন কোন্ অন্ধকার নরকে দীর্ঘশ্মশ্রু প্রেতের দলের মধ্যে এসে পড়েছে ওরা।

সেদিন অপরাহ্ণে যখন আল্‌ভারেজ তাঁবু ফেলে বিশ্রাম করবার হুকুম দিলে—তখন তাঁবুর বাইরে বসে এক পাত্র কফি খেতে খেতে শঙ্করের মনে হল, এ যেন সৃষ্টির আদিম যুগের অরণ্যানী, পৃথিবীর উদ্ভিদজগৎ যখন কোনো একটা সুনির্দিষ্ট রূপ ও আকৃতি গ্রহণ করেনি, যে যুগে পৃথিবীর বুকে বিরাটকায় সরীসৃপের দল জগৎজোড়া বনজঙ্গলের নিবিড় অন্ধকারে ঘুরে বেড়াতো—সৃষ্টির সেই অতীত প্রভাবে সে যেন কোন্ জাদুমন্ত্রের বলে ফিরে গিয়েছে—

সন্ধ্যার পরেই সমগ্র বনানী নিবিড় অন্ধকারে আবৃত হল। তাঁবুর বাইরে ওরা আগুন করেছে—সেই আলোর মণ্ডলীর বাইরে আর কিছু দেখা যায় না। এ বনের আশ্চর্য নিস্তব্ধতা শঙ্করকে বিস্মিত করছে। বনানীর সেই বিচিত্র নৈশ শব্দ এখানে স্তব্ধ কেন ? আল্‌ভারেজ চিন্তিত মুখে ম্যাপ দেখছিল। বললে—শোনো শঙ্কর, একটা কথা ভাবছি। আট হাজার ফুট উঠলাম, কিন্তু এখনও পর্বতের সেই খাঁজটা পেলাম না যেটা দিয়ে আমরা রেঞ্জ পার হয়ে ওপারে যাবো। আর কত ওপরে উঠবো ? যদি ধরো এই অংশে স্যাড্‌ল্‌টা নাই থাকে ?

শঙ্করের মনেও এ খটকা যে না জেগেছে তা নয়। সে আজই ওঠবার সময় মাঝে মাঝে ফিল্ড গ্লাস দিয়ে ওপরের দিকে দেখবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু ঘন মেঘে বা কুয়াশায় ওপরের দিকটা সর্বদাই আবৃত থাকায় তার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। সত্যিই তো, তারা কত উঠবে আর, সমতল খাঁজ যদি না পাওয়া যায় ? আবার নীচে নামতে হবে, আবার অন্য জায়গা বেয়ে উঠতে হবে। দফা সারা।

সে বললে—ম্যাপে কি বলে ?

আল্‌ভারেজের মুখ দেখে মনে হল ম্যাপের ওপর সে আস্থা হারিয়েছে। বললে—এ ম্যাপ অত খুঁটিনাটি ভাবে তৈরী নয়। এ পর্বতে উঠেছে কে যে ম্যাপ তৈরী হবে ? এই যে দেখছো-এখানা স্যার ফিলিপো ডি ফিলিপির তৈরী ম্যাপ, যিনি পর্তুগিজ পশ্চিম আফ্রিকার ফার্ডিনাণ্ডো পো শৃঙ্গ আরোহণ করে খুব নাম করেন, এবং বছর কয়েক আগে বিখ্যাত পর্বত আরোহণকারী পর্যটক ডিউক অফ আবুৎসির অভিযানেও যিনি ছিলেন। কিন্তু রিখ্‌টারস্‌ভেল্ড তিনি ওঠেননি, এ ম্যাপে পাহাড়ের যে কন্টুর আঁকা আছে, তা খুব নিখুঁত বলে মনে তো হয় না। ঠিক বুঝছি নে।

হঠাৎ শঙ্কর বলে উঠল—ও কি ?

তাঁবুর বাইরে প্রথমে একটা অস্পষ্ট আওয়াজ, এবং পরক্ষণেই একটা কষ্টকর কাশির শব্দ পাওয়া গেল—যেন থাইসিসের রোগী খুব কষ্টে কাতর ভাবে কাশ্‌ছে। একবার.....দু-বার.....তার পরেই শব্দটা থেমে গেল। কিন্তু সেটা মানুষের গলার শব্দ নয়, শোনবা মাত্রেই শঙ্করের সে কথা মনে হল।

রাইফেল নিয়ে সে ব্যস্তভাবে তাঁবুর বার হতে যাচ্ছে, আল্‌ভারেজ তাড়াতাড়ি উঠে ওর হাত ধরে বসিয়ে দিলে।

শঙ্কর আশ্চর্য হয়ে বললে—কেন, কিসের শব্দ ওটা ?

কথা বলে আল্‌ভারেজের দিকে চাইতেই ও বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করলে আল্‌ভারেজের মুখ বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে। শব্দটা শুনেই কি !

সঙ্গে সঙ্গে তাঁবুর অগ্নিকুণ্ডের মণ্ডলীর বাইরে নিবিড় অন্ধকারে একটা ভারী অথচ লঘুপদ জীব যেন বনজঙ্গলের মধ্যে দিয়ে চলে যাচ্ছে বেশ মনে হল।

দুজনেই খানিকটা চুপচাপ, তার পরে আল্‌ভারেজ বললে—আগুনে কাঠ ফেলে দাও। বন্দুক দুটো ভরা আছে কি না দেখ। ওর মুখের ভাব দেখে শঙ্কর ওকে আর কোনো প্রশ্ন করতে সাহস করলে না।

রাত্রি কেটে গেল।

পরদিন সকালে শঙ্করেরই আগে ঘুম ভাঙল। তাঁবুর বাইরে এসে কফি করবার আগুন জ্বালতে সে তাঁবু থেকে কিছুদূরে কাঠ ভাঙতে গেল। হঠাৎ তার নজর পড়ল ভিজে মাটির ওপর একটা পায়ের দাগ—লম্বায় দাগটা এগারো ইঞ্চির কম নয়, কিন্তু তিনটে মাত্র পায়ে আঙুল। তিন আঙুলেরই দাগ বেশ স্পষ্ট। পায়ের দাগ ধরে সে এগিয়ে গেল—আরও অনেকগুলো পায়ের দাগ আছে, সবগুলোতে সেই তিন আঙুল।

শঙ্করের মনে পড়ল ইউগান্ডার স্টেশন ঘরে আল্‌ভারেজের মুখে শোনা জিম্ কার্টারের মৃত্যুকাহিনী। গুহার মুখে বালির ওপর সেই অজ্ঞাত হিংস্র জানোয়ারের তিন আঙুলওয়ালা পায়ের দাগ। কাফির গ্রামের সর্দারের মুখে শোনা গল্প।

আল্‌ভারেজের কাল রাত্রের বিবর্ণ মুখও সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল। আর একদিনও আল্‌ভারেজ ঠিক এই রকমই ভয় পেয়েছিল, যেদিন পর্বতের পাদমূলে ওরা প্রথম এসে তাঁবু পাতে।

বুনিপ্! কাফির সর্দারের গল্পের সেই বুনিপ্ ! রিখ্‌টারস্‌ভেল্ড পর্বত ও অরণ্যের বিভীষিকা, যার ভয়ে শুধু অসভ্য মানুষ কেন, অন্য কোনো বন্য জন্তু পর্যন্ত এই আট হাজার ফুটের ওপরকার বনে আসে না। কাল রাত্রে কোনো জানোয়ারের শব্দ পাওয়া যায়নি কেন, এখন তা শঙ্করের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। আল্‌ভারেজ পর্যন্ত ভয়ে বিবর্ণ হয়ে উঠেছিল ওর গলার শব্দ শুনে। বোধ হয় ও শব্দের সঙ্গে আল্‌ভারেজের পূর্বে পরিচয় ঘটেছে।

আল্‌ভারেজের ঘুম ভাঙতে সেদিন একটু দেরি হল। গরম কফি এবং কিছু খাদ্য গলাধঃকরণ করবার সঙ্গে সঙ্গে সে আবার সেই নির্ভীক ও দুর্ধর্ষ আল্‌ভারেজ্, যে মানুষকেও ভয় করে না , শয়তানকেও না। শঙ্কর ইচ্ছে করেই আল্‌ভারেজকে ঐ অজ্ঞাত জানোয়ারের পায়ের দাগটা দেখালো না কি জানি যদি আল্‌ভারেজ বলে বসে—এখনও পাহাড়ের স্যাড্‌ল্ পাওয়া গেল না, তবে নেমে যাওয়া যাক।

সকালে সেদিন খুব মেঘ করে ঝম্‌ঝম্ করে বৃষ্টি নামলো। পর্বতের ঢালু বেয়ে যেন হাজার ঝরনার ধারায় বৃষ্টির জল গড়িয়ে নীচে নামছে। এই বন ও পাহাড় চোখে কেমন যেন ধাঁধা লাগিয়ে দেয়, এতটা উঠেছে ওরা কিন্তু প্রতি হাজার ফুট ওপর থেকে নীচের অরণ্যের গাছপালার মাথা দেখে সেগুলিকে সমতলভূমির অরণ্য বলে ভ্রম হচ্ছে—কাজেই প্রথমটা মনে হয় যেন কতটুকুই বা উঠেছি, ঐটুকু তো।

বৃষ্টি সেদিন থামলো না—বেলা দশটা পর্যন্ত অপেক্ষা করে আল্‌ভারেজ ওঠবার হুকুম দিলে। শঙ্কর এটা আশা করেনি। এখানে শঙ্কর কর্মী শ্বেতাঙ্গচরিত্রের একটা দিক লক্ষ্য করলে। তার মনে হচ্ছিল, কেন এই বৃষ্টিতে মিছে মিছে বার হওয়া ? একটা দিনে কি এমন হবে ? বৃষ্টি-মাথায় পথ চলে লাভ ?

অবিশ্রান্ত বৃষ্টিধারার মধ্যে ঘন অরণ্যানী ভেদ করে সেদিন ওরা সারাদিন উঠল । উঠছে, উঠছে, উঠছেই—শঙ্কর আর পারে না। কাপড়-চোপড় জিনিসপত্র, তাঁবু সব ভিজে একশা, একখানা রুমাল পর্যন্ত শুকনো নেই কোথাও—শঙ্করের কেমন একটা অবসাদ এসেছে দেহে ও মনে—সন্ধ্যার দিকে যখন সমগ্র পর্বত ও অরণ্য মেঘের অন্ধকারে ও সন্ধ্যার অন্ধকারে একাকার হয়ে ভীমদর্শন ও গম্ভীব হয়ে উঠল, ওর তখন মনে হল—এই অজানা দেশে অজানা পর্বতের মাথায় ভয়ানক হিংস্র জন্তুসঙ্কুল বনের মধ্যে দিয়ে, বৃষ্টিমুখর সন্ধ্যায়, কোন অনির্দেশ্য হীরকখনি বা তার চেয়েও অজানা মৃত্যুর অভিমুখে সে চলেছে কোথায় ! আল্‌ভারেজ কে তার ? তার পরামর্শে কেন সে এখানে এল ? হীরার খনিতে তার দরকার নেই। বাংলা দেশের খড়ে ছাওয়া ঘর, ছায়াভরা শান্ত গ্রাম্য পথ, ক্ষুদ্র নদী, পরিচিত পাখীদের কাকলী—সেসব যেন কতদূরের কোন্ অবাস্তব স্বপ্ন-রাজ্যের জিনিস, আফ্রিকার কোনো হীরকখনি তাদের চেয়ে মূল্যবান নয়।

কিন্তু তার এ ভাব কেটে গেল অনেক রাত্রে, যখন নির্মেঘ আকাশে চাঁদ উঠল। সে অপার্থিব জ্যোৎস্নাময়ী রজনীর বর্ণনা নেই। শঙ্কর আর পৃথিবীতে নেই, বাংলা বলে কোনো দেশ নেই। সব স্বপ্ন হয়ে গিয়েছে—সে আর কোথাও ফিরতে চায় না, হীরা চায় না—পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে বহু ঊর্ধ্বে এক কৌমুদী-শুভ্র দেবলোকের এখন সে অধিবাসী, তার চারিধারে যে সৌন্দর্য, কোনো মানুষের চোখ এর আগে তা কখনো দেখেনি। সে গহন নিস্তব্ধতা, এর আগে কোনো মানুষ অনুভব করেনি। জনমানবহীন বিশাল রিখ্‌টারসভেল্ড পর্বত ও অরণ্য এই গভীর নিশীথে মেঘলোকে আসন পেতে আপনাতে আপনি আত্মস্থ, ধ্যানস্তিমিত—পৃথিবীর মানুষের সেখানে প্রবেশ লাভের সৌভাগ্য ক্বচিৎ ঘটে।

সেই রাত্রে ঘুম থেকে ও ধড়মড়িয়ে উঠল আল্‌ভারেজের ডাকে। আল্‌ভারেজ ডাকছে-শঙ্কর, শঙ্কর, ওঠো বন্দুক বাগাও-

-কি-কি—

তার পর ও কান পেতে শুনলে—তাঁবুর চারিপাশে কে যেন ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তার জোরে নিঃশ্বাসের শব্দ বেশ শোনা যাচ্ছে, তাঁবুর মধ্যে থেকে। চাঁদ ঢলে পড়েছে, তাঁবুর বাইরে অন্ধকারই বেশী, জ্যোৎস্নাটুকু গাছের মগডালে উঠে গিয়েছে, কিছুই দেখা যাচ্ছে না। তাঁবুর দরজার মুখে আগুন তখনও একটু একটু জ্বলছে—কিন্তু তার আলোর বৃত্ত যেমন ছোট, আলোর জ্যোতিও ততোধিক ক্ষীণ, তাতে দেখবার সাহায্য কিছুই হয় না ।

হুড়মুড় করে একটা শব্দ হল—গাছপালা ভেঙে একটা ভারী জানোয়ার হঠাৎ ছুটে পালালো যেন। যেন তাঁবুর সকলে সজাগ হয়ে উঠেছে, এখন আর অতর্কিত শিকারের সুবিধে হবে না, বাইরের জানোয়ারটা তা বুঝতে পেরেছে।

জানোয়ারটা যাই হোক না কেন, তার যেন বুদ্ধি আছে, বিচারের ক্ষমতা আছে, মস্তিষ্ক আছে।

আল্‌ভারেজ রাইফেল হাতে টর্চ জ্বেলে বাইরে গেল। শঙ্করও গেল ওর পেছনে পেছনে। টর্চের আলোয় দেখা গেল, তাঁবুর উত্তর-পূর্ব কোণের জঙ্গলের চারা গাছপালার ওপর দিয়ে যেন একটা ভারী স্টীম রোলার চলে গিয়েছে। আল্‌ভারেজ্ সেইদিকে বন্দুকের নল উঁচিয়ে বার দুই দ্যাওড় করলো।

কোনো দিকে কোনো শব্দ পাওয়া গেল না।

তাঁবুতে ফেরবার সময় তাঁবুর ঠিক দরজার মুখে আগুনের কুণ্ডের অতি নিকটেই একটা পায়ের দাগ দুজনেরই চোখে পড়ল। তিনটে মাত্র আঙ্গুলের দাগ ভিজে মাটির ওপর সুস্পষ্ট।

এতে প্রমাণ হয়, জানোয়ারটা আগুনকে ডরায় না। শঙ্করের মনে হল, যদি ওদের ঘুম না ভাঙতো, তবে সেই অজ্ঞাত বিভীষিকাটি তাঁবুর মধ্যে ঢুকতে একটুও দ্বিধা করতো না—এবং তার পরে কি ঘটত তা কল্পনা করে কোনো লাভ নেই। আল্‌ভারেজ বললে—শঙ্কর, তুমি তোমার ঘুম শেষ করো, আমি জেগে আছি।

শঙ্কর বললো—না, তুমি ঘুমোও আল্‌ভারেজ।

আল্‌ভারেজ ক্ষীণ হাসি হেসে বললে—পাগল, তুমি জেগে কিছু করতে পারবে না, শঙ্কর। ঘুমিয়ে পড়া, ঐ দেখ দূরে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, আবার ঝড়বৃষ্টি আসবে, রাত শেষ হয়ে আসছে, ঘুমোও। আমি বরং একটু কফি খাই।

রাত ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে এল মুষলধারে বৃষ্টি, সঙ্গে সঙ্গে তেমনি বিদ্যুৎ, তেমনি মেঘগর্জন। সে বৃষ্টি চলল সমানে সারাদিন, তার বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই। শঙ্করের মনে হল, পৃথিবীতে আজ প্রলয়ের বর্ষণ হয়েছে শুরু, প্রলয়ের দেবতা সৃষ্টি ভাসিয়ে দেবার সূচনা করেছেন বুঝি। বৃষ্টির বহর দেখে আল্‌ভারেজ পর্যন্ত দমে গিয়ে তাঁবু ওঠাবার নাম মুখে আনতে ভুলে গেল।

বৃষ্টি থামল যখন, তখন বিকাল পাঁচটা। বোধ হয় বৃষ্টি না থামলেই ভাল ছিল, কারণ অমনি আল্‌ভারেজ চলা শুরু করবার হুকুম দিলে। বাঙালী ছেলের স্বভাবতই মনে হয় এখন অবেলায় যাওয়া কেন ? এত কি সময় বয়ে যাচ্ছে ? কিন্তু আল্‌ভারেজের কাছে দিন, রাত, বর্ষা, রৌদ্র, জ্যোৎস্না, অন্ধকার সব সমান। সে রাত্রে বর্ষাস্নাত বনভূমির মধ্যে দিয়ে মেঘভাঙা জ্যোৎস্নার আলোয় দুজনে উঠছে, উঠছে—এমন সময় আল্‌ভারেজ পেছন থেকে বলে উঠল—শঙ্কর দাঁড়াও, ঐ দেখ—

আল্‌ভারেজ ফিল্ড গ্লাস দিয়ে ফুটফুটে জ্যোৎস্নালোকে বাঁ পাশের পর্বতশিখরের দিকে চেয়ে দেখছে। শঙ্কর ওর হাত থেকে গ্লাসটা নিয়ে সেদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে। হ্যাঁ, সমতল খাঁজটা পাওয়া গিয়েছে ! বেশী দূরেও নয়, মাইল দুইয়ের মধ্যে, বাঁ দিকে ঘেঁষে।

আল্‌ভারেজ হাসিমুখে বললে—দেখেছ স্যাড্‌ল্‌টা ? থামবার দরকার নেই, চল আজ রাত্রেই স্যাড্‌লের ওপর পৌঁছে তাঁবু ফেলবো। শঙ্কর আর সত্যিই পারছে না। এ দুর্ধর্ষ পর্তুগিজ্‌টার সঙ্গে হীরার সন্ধানে এসে সে কি ঝকমারি না করেছে ! শঙ্কর জানে অভিযানের নিয়মানুযায়ী দলপতির হুকুমের ওপর কোনো কথা বলতে নেই। এখানে আল্‌ভারেজই দলপতি, তার আদেশ অমান্য করা চলবে না। কোথাও আইনে লিপিবদ্ধ না থাকলেও, পৃথিবীর ইতিহাসের বড় বড় অভিযানে সবাই এই নিয়ম মেনে চলে। সেও মানবে।

অবিশ্রান্ত হাঁটবার পরে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ওরা এসে স্যাড্‌লে যখন উঠল—শঙ্করের তখন আর এক পাও চলবার শক্তি নেই।

স্যাড্‌লটার বিস্তৃতি তিন মাইলের কম নয়, কখনো বা দুশো ফুট খাড়া উঠছে, কখনো বা চার-পাঁচশো ফুট নেমে গেল এক মাইলের মধ্যে, সুতরাং বেশ দুরারোহ—যতটুকু সমতল, ততটুকু শুধুই বড় বড় বনস্পতির জঙ্গল, ইরিথ্রিনা, পেনসিয়ানা, রিঠাগাছ, বাঁশ, বন্য আদা। বিচিত্র বর্ণের অর্কিডের ফুল ডালে ডালে। বেবুন ও কলোবাস্ বানর সর্বত্র।

আরও দু'দিন ধরে ক্রমাগত নামতে নামতে ওরা রিখটারস্ভেল্ড পর্বতের আসল রেঞ্জের ওপারের উপত্যকায় গিয়ে পদার্পণ করলো। শঙ্করের মনে হল, এদিকে জঙ্গল যেন আরও বেশী দুর্ভেদ্য ও বিচিত্র। আটলান্টিক মহাসাগরের দিক থেকে সমুদ্রবাষ্প উঠে কতক ধাক্কা খায় পশ্চিম আফ্রিকার ক্যামেরুন পর্বতে, বাকীটা আটকায় বিশাল রিখটারস্ভেল্ডের দক্ষিণ সানুতে-সুতরাং বৃষ্টি এখানে হয় অজস্র, গাছপালার তেজও তেমনি।

দিন পনেরো ধরে সে বিরাট অরণ্যাকীর্ণ উপত্যকার সর্বত্র দুজনে মিলে খুঁজেও আল্‌ভারেজ বর্ণিত পাহাড়ী নদীর কোনো ঠিকানা বার করতে পারলে না। ছোটখাটো ঝরানা দু-একটা উপত্যকার ওপর দিয়ে বইছে বটে—কিন্তু আল্‌ভারেজ কেবলই ঘাড় নাড়ে আর বলে—এসব নয়।

শঙ্কর বলে—তোমার ম্যাপ দ্যাখো না ভালো করে ? কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে, আল্‌ভারেজের ম্যাপের কোনো নিশ্চয়তা নেই। আল্‌ভারেজ বলে—ম্যাপ কি হবে, আমার মনে গভীর ভাবে আঁকা আছে সে নদী ও সে উপত্যকার ছবি—সে একবার দেখতে পেলেই তখুনি চিনে নেবো। এ সে জায়গাই নয়, এ উপত্যকাই নয়।

নিরুপায়। খোঁজো তবে।

একমাস কেটে গেল। পশ্চিম আফ্রিকায় বর্ষা নামল মার্চ মাসের প্রথমে। সে কী ভয়ানক বর্ষা ! শঙ্কর তার কিছু নমুনা পেয়ে এসেছে রিখ্‌টারস্‌ভেল্ড পার হবার সময়ে। উপত্যকা ভেসে গেল পাহাড় থেকে নামা বড় বড় পার্বত্য ঝরনার জলধারায়। তাঁবু ফেলবার স্থান নেই। একরাত্রে হঠাৎ অতিবর্ষণের ফলে ওদের তাঁবুর সামনে একটা নিরীহ ক্ষীণকায়া ঝরনাধারা ভীমমূর্তি ধারণ করে ওদের তাঁবুসুদ্ধ ওদের সুদ্ধ ভাসিয়ে নিয়ে যাবার যোগাড় করেছিল—আল্‌ভারেজের সজাগ ঘুমের জন্যে সে-যাত্রা বিপদ কেটে গেল ।

কিন্তু দিন যায় তো ক্ষণ যায় না। শঙ্কর একদিন ঘোর বিপদে পড়ল জঙ্গলের মধ্যে। সে বিপদটাও বড় অদ্ভুত ধরনের।

সেদিন আল্‌ভারেজ রাইফেল পরিষ্কার করছিল, সেটা শেষ করে রান্না করবে কথা ছিল। শঙ্কর রাইফেল হাতে বনের মধ্যে শিকারের সন্ধানে বার হয়েছে।

আল্‌ভারেজ বলে দিয়েছে তাকে এ বনে খুব সতর্ক হয়ে সাবধানে চলাফেরা করতে—আর বন্দুকের ম্যাগাজিনে সব সময় যেন কার্ট্রিজ ভরা থাকে। আর একটা খুব মূল্যবান উপদেশ দিয়েছে, সেটা এই- বনের মধ্যে বেড়াবার সময় হাতের কব্জিতে কম্পাস্‌ সর্বদা বেঁধে নিয়ে বেড়াবে এবং যে পথ দিয়ে যাবে, সে পথের ধারে গাছপালায় কোনো চিহ্ন রেখে যাবে, যাতে ফেরবার সময় সেই সব চিহ্ন ধরে আবার ঠিক ফিরতে পারো। নতুবা বিপদ অবশ্যম্ভাবী।

এদিন শঙ্কর স্প্রিংবক হরিণের সন্ধানে গভীর বনে চলে গিয়েছে। সকালে বেরিয়েছিল, ঘুরে ঘুরে বড় ক্লান্ত হয়ে পড়ে এক জায়গায় একটা বড় গাছের তলায় সে একটু বিশ্রামের জন্যে বসল।

সেখানটাতে চারিধারেই বৃহৎ বৃহৎ বনস্পতির মেলা, আর সব গাছেই গুঁড়ি ও ডালপালা বেয়ে একপ্রকারের বড় বড় লতা উঠে তাদের ছোট ছোট পাতা দিয়ে এমনি নিবিড় ভাবে আষ্টেপৃষ্ঠে গাছগুলো জড়িয়েছে যে গুঁড়ির আসল রং দেখা যায় না। কাছেই একটা ছোট্ট জলার ধারে ঝাড়ে ঝাড়ে মারিপোসা লিলি ফুটে রয়েছে।

খানিকটা সেখানে বসবার পরে শঙ্করের মনে হল তার কি একটা অস্বস্তি হচ্ছে। কি ধরনের অস্বস্তি তা সে কিছু বুঝতে পারলে না—অথচ জায়গাটা ছেড়ে উঠে যাবারও ইচ্ছে হল না—সে ক্লান্তও বটে, আর জায়াগাটাও বেশ আরামেরও বটে!

কিন্তু এ তার কি হল ! তার সমস্ত শরীরে এত অবসাদ কোথা থেকে এল? ম্যালেরিয়া জ্বরে ধরল নাকি ?

অবসাদটা কাটাবার জন্যে সে পকেট হাতড়ে একটা চুরুট বার করে ধরালে। কিসের একটা মিষ্টি মিষ্টি সুগন্ধ বাতাসে শঙ্করের বেশ ভাল লাগছে গন্ধটা। একটু পরে দেশলাইটা মাটি থেকে কুড়িয়ে পকেটে রাখতে গিয়ে মনে হল, হাতটা যেন তার নিজের নেই—যেন আর কারো হাত, তার মনের ইচ্ছায় সে হাত নড়ে না।

ক্রমে তার সর্বশরীর যেন বেশ একটা আরামদায়ক অবসাদে অবশ হয়ে পড়তে চাইল। কি হবে আর বৃথা ভ্রমণে, আলেয়ার পিছু পিছু বৃথা ছুটে, এই রকম বনের ঘন ছায়ায় নিভৃত লতাবিতানে অলস স্বপ্নে জীবনটা কাটিয়ে দেওয়ার চেয়ে সুখ আর কি আছে ?

একবার তার মনে হল, এই বেলা উঠে তাঁবুতে যাওয়া যাক, নতুবা তার কোনো একটা বিপদ ঘটবে যেন। একবার সে ওঠবার চেষ্টাও করতে গেল, কিন্তু পরক্ষণেই তার দেহমনব্যাপী অবসাদের জয় হল। অবসাদ নয়, যেন একটা মৃদুমধুর নেশায় আনন্দ। সমস্ত জগৎ তার কাছে তুচ্ছ। সে নেশাটাই তার সারাদেহ অবশ করে আনছে ক্রমশঃ।

শঙ্কর গাছের শিকড়ে মাথা দিয়ে ভাল করেই শুয়ে পড়ল। বড় বড় কটন উড গাছের ডালে শাখায় আলোছায়ার রেখা বড় অস্পষ্ট, কাছেই কোথাও বন্য পেচকের ধ্বনি অনেকক্ষণ থেকে শোনা যাচ্ছিল, ক্রমে যেন তা ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে আসছে। তারপরে কি হল শঙ্কর আর কিছু জানে না।

আল্‌ভারেজ যখন বহু অনুসন্ধানের পর ওর অচৈতন্য দেহটা কটন উড জঙ্গলের ছায়ায় আবিষ্কার করলে, তখন বেলা বেশী নেই। প্রথমটা আল্‌ভারেজ মনে ভাবলে, এ নিশ্চয়ই সর্পাঘাত—কিন্তু দেহটা পরীক্ষা করে সর্পাঘাতের কোনো লক্ষণ দেখাই গেল না। হঠাৎ মাথার ওপরকার ডালপালা ও চারিধারে গাছপালার দিকে নজর পড়তেই অভিজ্ঞ ভ্রমণকারী আল্‌ভারেজ ব্যাপারটা সব বুঝতে পারলে। সেখানটাতে সর্বত্র অতি মারাত্মক বিষ-লতার বন (Poison Ivy), যার রসে আফ্রিকার অসভ্য মানুষেরা তীরের ফলা ডুবিয়ে নেয়। যার বাতাস

এমনি বেশ সুগন্ধ বহন করে, কিন্তু নিঃশ্বাসের সঙ্গে বেশী মাত্রায় গ্রহণ করলে, অনেক সময় পক্ষাঘাত পর্যন্ত হতে পারে, মৃত্যু ঘটাও আশ্চর্য নয়।

তাঁবুতে এসে শঙ্কর দু-তিন দিন শয্যাগত হয়ে রইল। সর্বশরীর ফুলে ঢোল। মাথা যেন ফেটে যাচ্ছে আর সর্বদাই তৃষ্ণায় গলা কাঠ। আল্‌ভারেজ বলে—যদি তোমাকে সারারাত ওখানে থাকতে হতো—তা হলে সকালবেলা তোমাকে বাঁচানো কঠিন হতো।

একদিন একটা ঝরনার জলধারার বালুময় তীরে শঙ্কর হলদে রঙের কি দেখতে পেলে। আল্‌ভারেজ পাকা প্রসপেক্টর, সে এসে বালি ধুয়ে সোনার রেণু বার করলে কিন্তু তাতে সে বিশেষ উৎসাহিত হল না। সোনার পরিমাণ এত কম যে মজুরি পোষাবে না—এক টন বালি ধুয়ে আউন্স তিনেক সোনা পাওয়া হয়তো যেতে পারে।

শঙ্কর বললে— বসে থেকে লাভ কি, তবু যা সোনা পাওয়া যায়, তিন আউন্স সোনার দামও তো কম নয়।

সে যেটাকে অত্যন্ত অদ্ভুত জিনিস বলে মনে করেছে, অভিজ্ঞ প্রসপেক্টর আল্‌ভারেজের কাছে সেটা কিছুই নয়। তা ছাড়া শঙ্করের মজুরির ধারণার সঙ্গে আল্‌ভারেজের মজুরির ধারণা মিল খায় না। শেষ পর্যন্ত ও কাজ শঙ্করকে ছেড়ে দিতে হোল ।

ইতিমধ্যে ওরা মাসখানেক ধরে জঙ্গলের নানা অঞ্চলে বেড়ালে। আজ এখানে দু'দিন তাঁবু পাতে, সেখান থেকে আর এক জায়গায় উঠে যায়, সেখানে কিছুদিন তন্ন তন্ন করে চারিধার দেখবার পরে আর এক জায়গায় উঠে যায়। সেদিন অরণ্যের একটা স্থানে ওরা নতুন পৌঁছে তাঁবু পেতেছে। শঙ্কর বন্দুক নিয়ে দু-একটা পাখী শিকার করে সন্ধ্যায় তাঁবুতে ফিরে এসে দেখলে, আল্‌ভারেজ বসে চুরুট টানছে, তার মুখ দেখে মনে হল সে উদ্বিগ্ন ও চিন্তিত।

শঙ্কর বললে—আমি বলি আল্‌ভারেজ, তুমিই যখন বার করতে পারলে না, তখন চলো ফিরি।।

আল্‌ভারেজ বললে—নদীটা তো উড়ে যায়নি, এই বন পর্বতের কোনো না কোনো অঞ্চলে সেটা নিশ্চয়ই আছে।

—তবে আমরা বার করতে পারছি নে কেন ?

—আমাদের খোঁজা ঠিকমত হচ্ছে না।

বল কি আল্‌ভারেজ, ছ'মাস ধরে জঙ্গল চষে বেড়াচ্ছি, আবার কাকে খোঁজা বলে ?

আল্‌ভারেজ গম্ভীর মুখে বললে—কিন্তু মুশকিল হয়েছে কোথায় জানো, শঙ্কর ? তোমাকে এখনও কথাটা বলিনি, শুনলে হয়তো খুব দমে যাবে বা ভয় পাবে। আচ্ছা তোমাকে একটা জিনিস দেখাই, এসো আমার সঙ্গে।

শঙ্কর অধীর আগ্রহ ও কৌতূহলের সঙ্গে ওর পেছনে পেছনে চললো। ব্যাপারটা কি ?

আল্‌ভারেজ একটু দূরে গিয়ে একটা বড় গাছের তলায় দাঁড়িয়ে বললে—শঙ্কর, আমরা আজই এখানে এসে তাঁবু পেতেছি, ঠিক তো ?

শঙ্কর অবাক হয়ে বললে—এ কথার মানে কি? আজই তো এখানে এসেছি, না আবার কবে এসেছি ?

—আচ্ছা, এই গাছের গুঁড়ির কাছে সরে এসে দ্যাখো তো ?

শঙ্কর এগিয়ে গিয়ে দেখলে, গুঁড়ির নরম ছাল ছুরি দিয়ে খুদে কে 'DA' লিখে রেখেছে—কিন্তু লেখাটা টাটকা নয়, অন্ততঃ মাসখানেকের পুরোনো।

শঙ্কর ব্যাপারটা কিছু বুঝতে পারলে না। আল্‌ভারেজের মুখের দিকে চেয়ে রইল । আল্‌ভারেজ বললে বুঝতে পারলে না? এই গাছে আমিই মাসখানেক আগে আমার নামের অক্ষর দুটি খুদে রাখি। আমার মনে একটু সন্দেহ হয়। তুমি তো বুঝতে পারো না, তোমার কাছে সব বনই সমান। এর মানে এখন বুঝেছ ? আমরা চক্রাকারে বনের মধ্যে ঘুরছি । এসব জায়গায় যখন এরকম হয়, তখন তা থেকে উদ্ধার পাওয়া বেজায় শক্ত।

এতক্ষণে শঙ্কর বুঝলে ব্যাপারটা। বললে—তুমি বলতে চাও, মাসখানেক আগে আমরা এখানে এসেছিলাম?

—ঠিক তাই। বড় অরণ্যে বা মরুভূমিতে এই বিপদ ঘটে। একে বলে death circle, আমার মনে মাসখানেক আগে প্রথমে সন্দেহ হয় যে, হয়তো আমরা death circle-এ পড়েছি। সেটা পরীক্ষা করে দেখবার জন্যেই গাছের ছালে ঐ অক্ষর খুদে রাখি। আজ বনের মধ্যে বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ চোখে পড়ল।

শঙ্কর বললে—আমাদের কম্পাসের কি হল ? কম্পাস থাকতে দিক ভুল হচ্ছে কি ভাবে রোজ রোজ ?

আল্‌ভারেজ বললে—আমার মনে হয় কম্পাস খারাপ হয়ে গিয়েছে। রিখ্‌টারস্‌ভেল্ড পার হবার সময় সেই যে ভয়ানক ঝড় ও বিদ্যুৎ হয়, তাতেই কিভাবে ওর চৌম্বক শক্তি নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

—তা হলে আমাদের কম্পাস এখন অকেজো ?

—আমার তাই ধারণা।

শঙ্কর দেখলে অবস্থা নিতান্ত মন্দ নয়। ম্যাপ ভুল, কম্পাস অকেজো, তার ওপর ওরা পড়েছে এক ভীষণ দুর্গম গহনারণ্যের মাঝে বিষম মরণ ঘূর্ণিতে। জনমানুষ নেই, খাবার নেই, জলও নেই বললেই হয়, কারণ যেখানকার সেখানকার জল যখন পানের উপযুক্ত নয়। থাকার মধ্যে আছে এক ভীষণ অজ্ঞাত মৃত্যুর ভয়। জিম কার্টার এই অভিশপ্ত অরণ্যানীর মধ্যে রত্নের লোভে এসে প্রাণ দিয়েছিল, এখানে কারো মঙ্গল হবে বলে মনে হয় না।

আল্‌ভারেজ কিন্তু দমে যাবার পাত্রই নয়। সে দিনের পর দিন চলল বনের মধ্যে দিয়ে। বনের কোনো কূলকিনারা পায় না শঙ্কর, আগে যাও বা ছিল, ঘূর্ণিপাকে তারা ঘুরছে শোনা অবধি শঙ্করের দিক সম্বন্ধে জ্ঞান একেবারে লোপ পেয়েছে।

দিন তিনেক পরে ওরা একটি জায়গায় এসে উপস্থিত হল, সেখানে রিখটারস্ভেল্ডের একটি শাখা আসল পর্বতমালার সঙ্গে সমকোণ করে উত্তরদিকে লম্বালম্বি হয়ে আছে। খুব কম হলেও সেটা ৪০০০ হাজার ফুট উঁচু। আরও পশ্চিমদিকে একটা খুব উঁচু পর্বতচূড়া ঘন মেঘের আড়ালে লুকোচুরি খেলছে। দুই পাহাড়ের মধ্যেকার উপত্যকা তিন মাইল বিস্তীর্ণ হবে এবং এই উপত্যকা খুব ঘন জঙ্গলে ভরা।

বনে গাছপালার যেন তিনটে চারটে থাক। সকলের ওপরের থাকে শুধুই পরগাছা ও শেওলা, মাঝের থাকে ছোট বড় বনস্পতির ভিড়, নীচের থাকে ঝোপঝাপ, ছোট ছোট গাছ। সূর্যের আলোর বালাই নেই বনের মধ্যে।

আল্‌ভারেজ বনের মধ্যে না ঢুকে বনের ধারেই তাঁবু ফেলতে বললে। সন্ধ্যার সময় ওরা কফি খেতে খেতে পরামর্শ করতে বসল যে, এখন কি করা যাবে। খাবার একদম ফুরিয়েছে, চিনি অনেকদিন থেকেই নেই, সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে আর দু-এক দিন পরে কফিও শেষ হবে। সামান্য কিছু ময়দা এখনও আছে—কিন্তু আর কিছুই নেই। ময়দা এই জন্যে আছে যে ওরা ও জিনিসটা কালেভদ্রে ব্যবহার করে। ওদের প্রধান ভরসা বন্য জন্তুর মাংস কিন্তু সঙ্গে যখন ওদের গুলি-বারুদের কারখানা নেই, তখন শিকারের ভরসাই বা চিরকাল করা যায় কি করে ?

কথা বলতে বলতে শঙ্কর দূরের যে পাহাড়ের চূড়াটা মেঘের আড়ালে লুকোচুরি খেলছে, সেদিকে মাঝে মাঝে চেয়ে দেখছিল। এই সময়ে অল্পক্ষণের জন্যে মেঘ সম্পূর্ণরূপে সরে গেল। চূড়াটার অদ্ভুত চেহারা, যেন একটা কুলপী বরফের আগার দিকটা কে এক কামড়ে খেয়ে ফেলেছে।

আল্‌ভারেজ বললে—এখান থেকে দক্ষিণ পূর্বদিকে বুলাওয়েও কি সল্‌স্‌বেরী চারশো থেকে পাঁচশো মাইলের মধ্যে। মধ্যে শ-দুই মাইল মরুভূমি। পশ্চিমদিকে উপকূল তিনশো মাইলের মধ্যে বটে, কিন্তু পর্তুগিজ পশ্চিম আফ্রিকা অতি ভীষণ দুর্গম জঙ্গলে ভরা, সুতরাং সেদিকের কথা বাদ দাও। এখন আমাদের উপায় হচ্ছে, হয় তুমি নয় আমি সল্‌স্‌বেরী কি বুলাওয়েও চলে গিয়ে টোটা ও খাবার কিনে আনি। কম্পাসও চাই।

আল্‌ভারেজের মুখের এই কথাটা বড় শুভক্ষণে শঙ্কর শুনেছিল। দৈব মানুষের জীবনে যে কত কাজ করে, তা মানুষে কি সব সময়ে বোঝে ? দৈবক্রমে 'বুলাওয়েও' ও 'সল্‌সবেরী'। দুটো শহরের নাম, তাদের অবস্থানের দিক ও এই জায়গাটা থেকে তাদের আনুমানিক দূরত্ব শঙ্করের কানে গেল। এর পর যে কতবার মনে মনে আল্‌ভারেজকে ধন্যবাদ দিয়েছিল এই নাম দুটো বলবার জন্যে।

কথাবার্তা সেদিন বেশী অগ্রসর হল না। দুজনেই পরিশ্রান্ত ছিল, সকাল সকাল শয্যা আশ্রয় করলে।

আট

মাঝরাত্রে শঙ্করের ঘুম ভেঙে গেল। কি একটা শব্দ হচ্ছে ঘন বনের মধ্যে, কি একটা কাণ্ড কোথায় ঘটছে বনে। আল্‌ভারেজও বিছানায় উঠে বসেছে। দুজনেই কান-খাড়া করে শুনলে বড় অদ্ভুত ব্যাপার! কি হচ্ছে বাইরে ?

শঙ্কর তাড়াতাড়ি টর্চ জেলে বাইরে আসছিল, আল্‌ভারেজ বারণ করলে। বললে—এসব অজানা জঙ্গলে রাত্রিবেলা ওরকম তাড়াতাড়ি তাঁবুর বাইরে যেও না, তোমাকে অনেকবার সতর্ক করে দিয়েছি। বিনা বন্দুকেই বা যাচ্ছ কোথায় ?

তাঁবুর বাইরে রাত্রি ঘুটঘুটে অন্ধকার ! দুজনেই টর্চ ফেলে দেখলে বন্য জন্তুর দল গাছপালা ভেঙে ঊর্ধ্বশ্বাসে উন্মত্তের মত দিক্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে পশ্চিমের সেই ভীষণ জঙ্গল থেকে বেরিয়ে, পূর্বদিকে পাহাড়টার দিকে চলেছে ! হায়েনা, বেবুন, বুনো মহিষ। দুটো চিতাবাঘ তো ওদের গা ঘেঁষে ছুটে পালালো। আরও আসছে....দলে দলে আসছে....ধাড়ী ও মাদী কলোবাস্ বাঁদর দলে দলে ছানাপোনা নিয়ে ছুটেছে। সবাই যেন কোনো আকস্মিক বিপদের মুখ থেকে প্রাণের ভয়ে ছুটেছে!....আর সঙ্গে সঙ্গে দূরে কোথায় একটা অদ্ভুত শব্দ হচ্ছে—চাপা, গম্ভীর, মেঘগর্জনের মত শব্দটা কিংবা দূরে কোথাও হাজারটা জয়ঢাক যেন একসঙ্গে বাজছে !

ব্যাপার কি ! দুজনে দুজনের মুখের দিকে চাইলে। দুজনেই অবাক। আল্‌ভারেজ্ বললে—শঙ্কর, আগুনটা ভাল করে জ্বালো নয়তো বন্যজন্তুর দল আমাদের তাঁবুসুদ্ধ ভেঙে মাড়িয়ে চলে যাবে।

জন্তুদের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলল যে ! মাথার ওপরেও পাখীর দল বাসা ছেড়ে পালাচ্ছে। প্রকাণ্ড একটা স্প্রিংবক হরিণের দল ওদের দশগজের মধ্যে এসে পড়ল।

কিন্তু ওরা দুজনে তখন এমন হতভম্ব হয়ে গিয়েছে ব্যাপার দেখে যে, এত কাছে পেয়েও গুলি করতে ভুলে গেল। এমন ধরনের দৃশ্য ওরা জীবনে কখনো দেখেনি !

শঙ্কর আল্‌ভারেজকে কি একটা জিজ্ঞাসা করতে যাবে, তার পরেই প্রলয় ঘটল। অন্ততঃ শঙ্করের তো তাই বলেই মনে হলো। সমস্ত পৃথিবীটা দুলে এমন কেঁপে উঠল যে, ওরা দুজনেই টলে পড়ে গেল মাটিতে, সঙ্গে সঙ্গে হাজারটা বাজ যেন নিকটেই কোথায় পড়ল। মাটি যেন চিরে ফেঁড়ে গেল—আকাশটাও যেন সেই সঙ্গে ফাটলো।

আল্‌ভারেজ্ মাটি থেকে ওঠবার চেষ্টা করতে করতে বললে ভূমিকম্প !

কিন্তু পরক্ষণেই তারা দেখে বিস্মিত হল, রাত্রির অমন ঘুটঘুটে অন্ধকার হঠাৎ দূর হয়ে, পঞ্চাশহাজার বাতির এমন বিজলি আলো জ্বলে উঠল কোথা থেকে ?

তারপর তাদের নজর পড়ল, দূরের সেই পাহাড়ের চূড়াটার দিকে। সেখানে যেন একটা প্রকাণ্ড অগ্নিলীলা শুরু হয়েছে। রাঙা হয়ে উঠেছে সমস্ত দিগন্ত সেই প্রলয়ের আলোয়, আগুনরাঙা মেঘ ফুঁসিয়ে উঠছে পাহাড়ের চুড়ো থেকে দু-হাজার আড়াই হাজার ফুট পর্যন্ত উঁচুতে—সঙ্গে
সঙ্গে কি বিশ্রী গন্ধকের উৎকট নিঃশ্বাস-রোধকারী গন্ধ বাতাসে!

আল্‌ভারেজ সেদিকে চেয়ে ভয়ে ও বিস্ময়ে বলে উঠল—আগ্নেয়গিরি ! সান্টা আনা গ্রাৎসিয়া ডা কর্ডোভা !

কি অদ্ভুত ধরনের ভীষণ সুন্দর দৃশ্য ! কেউ চোখ ফিরিয়ে নিতে পারলে না ওরা খানিকক্ষণ। লক্ষটা তুবড়ি একসঙ্গে জ্বলছে, লক্ষটা রঙমশালে একসঙ্গে আগুন দিয়েছে, শঙ্করের মনে হল। রাঙা আগুনের মেঘ মাঝে মাঝে নীচু হয়ে যায়, হঠাৎ যেমন আগুনে ধুনো পড়লে দপ্ করে জ্বলে ওঠে, অমনি দপ্ করে হাজার ফুট ঠেলে ওঠে। আর সেই সঙ্গে হাজারটা বোমা ফাটার আওয়াজ।

এদিকে পৃথিবী এমন কাঁপছে যে দাঁড়িয়ে থাকা যায় না—কেবল টলেটলে পড়তে হয়। শঙ্কর তো টলতে টলতে তাঁবুর মধ্যে ঢুকলো—ঢুকে দেখে একটা ছোট কুকুরছানার মত জীব তার বিছানায় একসঙ্গে গুটিসুটি হয়ে ভয়ে কাঁপছে। শঙ্করের টর্চের আলোয় সেটা থতমত খেয়ে আলোর দিকে চেয়ে রইল, আর তার চোখ দুটো মণির মত জ্বলতে লাগল। আল্‌ভারেজ তাঁবুতে ঢুকে দেখে বললে—নেকড়ে বাঘের ছানা। রেখে দাও, আমাদের আশ্রয় নিয়েছে যখন প্রাণের ভয়ে।

ওরা কেউ এর আগে প্রজ্বলন্ত আগ্নেয়গিরি দেখেনি, তা থেকে বিপদ আসতে পারে ওদের জানা নেই কিন্তু আল্‌ভারেজের কথা ভালো করে শেষ হতে না হতে, হঠাৎ কি প্রচণ্ড ভারী জিনিসের পতনের শব্দে ওরা আবার তাঁবুর বাইরে গিয়ে যখন দেখলে যে, একখানা পনেরো সের ওজনের জ্বলন্ত কয়লার মত রাঙা পাথর অদূরে একটা ঝোপের ওপর এসে পড়েছে—সঙ্গে সঙ্গে ঝোপটাও জ্বলে উঠেছে—তখন আল্‌ভারেজ ব্যস্তসমস্ত হয়ে বললে—পালাও, পালাও ; শঙ্কর—তাঁবু ওঠাও-শীগ্গির-

ওরা তাঁবু ওঠাতে ওঠাতে আরও দু-পাঁচখানা আগুন-রাঙা জ্বলন্ত ভারী পাথর এদিকে ওদিকে সশব্দে পড়ল । নিঃশ্বাস তো এদিকে বন্ধ হয়ে আসে, এমনি ঘন গন্ধকের ধূম বাতাসে ছড়িয়েছে।

দৌড়....দৌড়....দৌড়। দুঘণ্টা ধরে ওরা জিনিসপত্র কতক টেনে হিঁচড়ে, কতক বয়ে নিয়ে পুবদিকের সেই পাহাড়ের নীচে গিয়ে পৌঁছুলো। সেখানে পর্যন্ত গন্ধকের গন্ধ বাতাসে। আধঘণ্টা পরে সেখানেও পাথর পড়তে শুরু করলে। ওরা পাহাড়ের ওপর উঠল, সেই ভীষণ জঙ্গল আর রাত্রির অন্ধকার ঠেলে। ভোর যখন হল, তখন আড়াই হাজার ফুট উঠে পাহাড়ের ঢালুতে বড় গাছের তলায় দুজনেই হাঁপাতে হাঁপাতে বসে পড়ল।

সূর্য ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে অগ্ন্যুৎপাতের সে ভীষণ সৌন্দর্য অনেকখানি কমে গেল, কিন্তু শব্দ ও পাথর পড়া যেন বাড়লো। এবার শুধু পাথর নয়, তার সঙ্গে খুব মিহি ধূসরবর্ণের ছাই আকাশ থেকে পড়ছে—গাছপালা লতাপাতার ওপর দেখতে দেখতে পাতলা একপুরু ছাই জমে গেল।

সারাদিন সমানভাবে অগ্নিলীলা চললো—আবার রাত্রি এল। নিম্নের উপত্যকাভূমির অত বড় হেমলক গাছের জঙ্গল দাবানলে ও প্রস্তরবর্ষণে সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেল। রাত্রিতে আবার সেই ভীষণ সৌন্দর্য, কতদূর পর্যন্ত বন ও আকাশ, কতদূরের দিগন্ত লাল হয়ে উঠেছে পর্বতের অগ্নিকটাহের আগুনে—তখন পাথর পড়াটা একটু কেবল কমেছে। কিন্তু সেই রাঙা আগুন ভরা বাষ্পের মেঘ তখনও সেই রকমই দীপ্ত হয়ে আছে।

রাত দুপুরের পরে একটা বিরাট বিস্ফোরণের শব্দে ওদের তন্দ্রা ছুটে গেল—ওরা সভয়ে চেয়ে দেখলে জ্বলন্ত পাহাড়ের চূড়ার মুণ্ডটা উড়ে গিয়েছে—নীচের উপত্যকাতে ছাই, আগুন ও জ্বলন্ত পাথর ছড়িয়ে পড়ে অবশিষ্ট জঙ্গলটাকেও ঢাকা দিলে। আল্‌ভারেজ পাথরের ঘায়ে আহত হল। ওদের তাঁবুর কাপড়ে আগুন ধরে গেল। পেছনের একটা উঁচু গাছের ডাল ভেঙে পড়ল পাথরের চোট খেয়ে।

শঙ্কর ভাবছিল—এই জনহীন অরণ্য অঞ্চলে এত বড় একটা প্রাকৃতিক বিপর্যয় যে ঘটে গেল, তা কেউ দেখতেও পেতো না, যদি তারা না থাকতো! সভ্য জগৎ জানেও না আফ্রিকার গহন অরণ্যের এ আগ্নেয়গিরির অস্তিত্ব। কেউ বললেও বিশ্বাস করবে না হয়তো।।

সকালে বেশ স্পষ্ট দেখা গেল, মোমবাতি হাওয়ার মুখে জ্বলে গিয়ে যেমন মাথার দিকে অসমান খাঁজের সৃষ্টি করে, পাহাড়ের চূড়াটার তেমনি চেহারা হয়েছে। কুলপী বরফটাতে ঠিক যেন কে আর একটা কামড় বসিয়েছে।

আল্‌ভারেজ ম্যাপ দেখে বললে—এটা আগ্নেয়গিরি বলে ম্যাপে দেওয়া নেই। সম্ভবত বহু বৎসর পরে এই এর প্রথম অগ্ন্যুৎপাত। কিন্তু এর যে নাম ম্যাপে দেওয়া আছে, তা খুব অর্থপূর্ণ।

শঙ্কর বললে—কি নাম ?

আল্‌ভারেজ বললে—এর নাম লেখা আছে 'ওল্‌ডোনিও লেঙ্গাই'—প্রাচীন জুলু ভাষায় এর মানে 'অগ্নিদেবের শয্যা'। নামটা দেখে মনে হয়, এ অঞ্চলের প্রাচীন লোকেদের কাছে এ পাহাড়ের আগ্নেয়-প্রকৃতি অজ্ঞাত ছিল না। বোধ হয় তার পর দু-একশো বছর কিংবা তারও বেশীকাল এটা চুপচাপ ছিল।

ভারতবর্ষের ছেলে শঙ্করের দুই হাত আপনা-আপনি প্রণামের ভঙ্গিতে ললাট স্পর্শ করলে। প্রণাম, হে রুদ্রদেব, প্রণাম। আপনার তাণ্ডব দেখবার সুযোগ দিয়াছিলেন, এজন্যে প্রণাম গ্রহণ করুন, হে দেবতা। আপনার এ রূপের কাছে শত হীরকখনি তুচ্ছ হয়ে যায়। আমার সমস্ত কষ্ট সার্থক হল।।

নয়

আগ্নেয় পর্বতের অত কাছে বাস করা আল্‌ভারেজ উচিত বিবেচনা করলে না। ওলডোনিও লেঙ্গাই পাহাড়ের ধূমায়িত শিখরদেশের সান্নিধ্য পরিত্যাগ করে তারা আরও পশ্চিম ঘেঁষে চলতে লাগল। সেদিকের গহন অরণ্যে আগুনের আঁচটিও লাগেনি, বর্ষার জলে সে অরণ্য আরও নিবিড় হয়ে উঠেছে, ছোট ছোট গাছপালার ও লতাঝোপের সমাবেশে। ছোট বড় কত ঝরনাধারা ও পার্বত্য নদী বয়ে চলেছে তাদের মধ্যে একটাও আল্‌ভারেজের পূর্ব পরিচিত নয়।

এইবার এক জায়গায় ওরা এসে উপস্থিত হল, যেখানে চারিদিকেই চুনাপাথর ও গ্রানাইটের ছোট বড় পাহাড় ও প্রত্যেক পাহাড়ের গায়েই নানা আকারের গুহা। স্থানটার প্রাকৃতিক দৃশ্য রিখ্‌টারসভেল্ডের সাধারণ দৃশ্য থেকে একটু অন্যরকম। এখানে বন তত ঘন নয়, কিন্তু খুব বড় বড় গাছ চারিদিকে, আর যেখানে সেখানে পাহাড় ও গুহা।

একটা উঁচু ঢিবির মত গ্রানাইটের পাহাড়ের ওপর ওরা তাঁবু ফেলে রইল। এখানে এসে পর্যন্ত শঙ্করের মনে হয়েছে জায়গাটা ভাল নয়। কি একটা অস্বস্তি, মনের মধ্যে কি একটা আসন্ন বিপদের আশঙ্কা, তা সে না পারে ভাল করে নিজে বুঝতে না পারে আল্‌ভারেজকে বোঝাতে।

একদিন আল্‌ভারেজ বলল—সব মিথ্যে শঙ্কর, আমরা এখনও বনের মধ্যে ঘুরছি। আজ সেই গাছটা আবার দেখেছি, সেই D.A. লেখা। অথচ তোমার মনে আছে, আমরা যতদূর সম্ভব পশ্চিমদিক ঘেঁষেই চলেছি আজ পনেরো দিন। কি করে আমরা আবার সেই গাছের কাছে আসতে পারি ?

শঙ্কর বললে—তবে এখন কি উপায় ?

—উপায় আছে। আজ রাত্রে একটা বড় গাছের মাথায় উঠে নক্ষত্র দেখে দিক্‌নির্ণয় করতে হবে। তুমি তাঁবুতে থেকো।

শঙ্কর একটা কথা বুঝতে পারছিল না। তারা যদি চক্রাকারে ঘুরছে, তবে এই অনুচ্চ শৈলমালা ও গুহার দেশে কি করে এল ? এ অঞ্চলে তো কখনো আসেনি বলেই মনে হয়। আল্‌ভারেজ এর উত্তরে বললে, গাছটাতে নাম খোদাই দেখে সে আর কখনো তার পূর্বে আসবার চেষ্টা করেনি। পূর্বদিকে মাইল দুই এলেই এই স্থানটাতে ওরা পৌছুতো।

সে রাত্রে শঙ্কর একা তাঁবুতে বসে বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ' পড়ছিল। এই একখানাই বাংলা বই সে দেশ থেকে আসবার সময় সঙ্গে করে আনে, এবং বহুবার পড়লেও সময় পেলেই আবার পড়ে।

কতদূরে ভারতবর্ষ, তার মধ্যে চিতোর, মেওয়ার, মোগল-রাজপুতের বিবাদ ! এই অজানা মহাদেশের অজানা মহা অরণ্যানীর মধ্যে বসে সে-সব যেন অবাস্তব বলে মনে হয়।

তাঁবুর বাইরে হঠাৎ যেন পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। শঙ্কর প্রথমটা ভাবলে, আলভারেজ গাছ থেকে নেমে ফিরে আসছে বোধ হয়—কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে হল, এ মানুষের স্বাভাবিক পায়ের শব্দ নয়, কেউ দু-পায়ে থলে জড়িয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে মাটিতে পা ঘেঁষে ঘেঁষে টেনে টেনে চললে যেন এমন ধরনের শব্দ হওয়া সম্ভব। আল্‌ভারেজের উইন্‌চেস্টার রিপিটারটা হাতের কাছেই ছিল, ও সেটা তাঁবুর দরজার দিকে বাগিয়ে বসলো। বাইরে পদশব্দটা একবার থেমে গেল—পরেই আবার তাঁবুর দক্ষিণ পাশ থেকে বাঁ দিকে এল। একটা কোনো বড় প্রাণীর যেন ঘন ঘন নিঃশ্বাসের শব্দ পাওয়া গেল—ঠিক যেমন পর্বত পার হবার সময় এক রাত্রে ঘটেছিল, ঠিক এই রকমই। শঙ্কর একটু ভয় খেয়ে সংযম হারিয়ে ফেলে রাইফেল ছুঁড়ে বসলো। একবার....দু-বার

সঙ্গে সঙ্গে মিনিট দুই পরে দূরের গাছের মাথা থেকে প্রত্যুত্তরে দু-বার রিভলভারের আওয়াজ পাওয়া গেল। আলভারেজ মনে ভেবেছে, শঙ্করের কোন বিপদ উপস্থিত, নতুবা রাত্রে খামোকা বন্দুক ছুঁড়বে কেন ? বোধ হয় সে তাড়াতাড়ি নেমেই আসছে।

এদিকে চারিদিক থেকে বন্দুকের আওয়াজে জানোয়ারটা বোধহয় পালিয়েছে, আর তার সাড়াশব্দ নেই। শঙ্কর টর্চ জ্বেলে তাঁবুর বাইরে এসে ভাবলে, আলভারেজকে সঙ্কেতে গাছ থেকে নামতে বারণ করবে, এমন সময় কিছুদূরে বনের মধ্যে হঠাৎ আবার দু-বার পিস্তলের আওয়াজ এবং সেই সঙ্গে একটা অস্পষ্ট চীৎকার শুনতে পাওয়া গেল।

শঙ্কর পিস্তলের আওয়াজ লক্ষ্য করে ছুটে গেল। কিছুদূরে গিয়েই দেখলে বনের মধ্যে একটা বড় গাছের তলায় আল্‌ভারেজ শুয়ে। টর্চের আলোয় তাকে দেখে শঙ্কর শিউরে উঠল ভয়ে বিস্ময়ে— তার সর্বশরীর রক্তমাখা, মাথাটা বাকী শরীরের সঙ্গে একটা অস্বাভাবিক কোণের সৃষ্টি করেছে, গায়ের কোটটা ছিন্নভিন্ন।

শঙ্কর তাড়াতাড়ি ওর পাশে গিয়ে বসে ওর মাথাটা নিজের কোলে তুলে নিলে। ডাকলে—আল্‌ভারেজ ! আল্‌ভারেজ !

আল্‌ভারেজের সাড়া নেই। তার ঠোঁট দুটো একবার যেন নড়ে উঠল, কি যেন বলতে গেল, সে শঙ্করের দিকে চেয়েই আছে, অথচ সে চোখে যেন দৃষ্টি নেই; অথবা কেমন যেন নিস্পৃহ, উদাস দৃষ্টি।

শঙ্কর ওকে বহন করে তাঁবুতে নিয়ে এল। মুখে জল দিল, তার পর গায়ের কোটটা খুলতে গিয়ে দেখে গলার নীচে কাঁধের দিক খানিকটা জায়গার মাংস কে যেন ছিঁড়ে নিয়েছে। সারা পিঠটার সেই অবস্থা। কোন এক অসাধারণ বলশালী জন্তু তীক্ষ্ণধার নখে বা দন্তে পিঠখানা চিরে ফালা ফালা করেছে।

পাশেই নরম মাটিতে কোনো জন্তুর পায়ের দাগ।

তিনটে মাত্র আঙ্গুল সে পায়ে।

সারারাত্রি সেই ভাবেই কাটল, আল্‌ভারেজের সাড়া নেই, সংজ্ঞা নেই। সকাল হবার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ যেন তার চেতনা ফিরে এল। শঙ্করের দিকে বিস্ময়ের ও অচেনার দৃষ্টিতে চেয়ে দেখলে, যেন এর আগে সে কখনো শঙ্করকে দেখেনি। তার পর আবার চোখ বুজল। দুপুরের পর খুব সম্ভবতঃ নিজের মাতৃভাষায় কি সব বকতে শুরু করল, শঙ্কর একবর্ণও বুঝতে পারলে না। বিকেলের দিকে সে হঠাৎ শঙ্করের দিকে চাইলে। চাইবার সঙ্গে সঙ্গে শঙ্করের মনে হল, সে ওকে চিনতে পেরেছে। এইবার ইংরাজীতে বললে—শঙ্কর ! এখনও বসে আছ ? তাঁবু ওঠাও—চল যাই। তার পর অপ্রকৃতিস্থের মত নির্দেশহীন ভঙ্গিতে হাত তুলে বললে—রাজার ঐশ্বর্য লুকোনো রয়েছে ঐ পাহাড়ের গুহার মধ্যে—তুমি দেখতে পাচ্ছ না—আমি দেখতে পাচ্ছি। চল আমরা যাই—তাঁবু ওঠাও—দেরি কোরো না।

এই আল্‌ভারেজের শেষ কথা।

তারপর কতক্ষণ শঙ্কর স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। সন্ধ্যা হল, একটু একটু করে সমগ্র বনানী ঘন অন্ধকারে ডুবে গেল।

শঙ্করের তখন চমক ভাঙল। সে তাড়াতাড়ি উঠে আগে আগুন জ্বাললে, তার পর দুটো রাইফেলে টোটা ভরে, তাঁবুর দোরের দিকে বন্দুকের নল বাগিয়ে, আল্‌ভারেজের মৃতদেহের পাশে একখানা শতরঞ্জির ওপর বসে রইল।

তারপর সে রাত্রে আবার নামলো তেমনি ভীষণ বর্ষা। তাঁবুর কাপড় ফুঁড়ে জল পড়ে জিনিসপত্র ভিজে গেল। শঙ্কর তখন কিন্তু এমন হয়ে গিয়েছে যে, তার কোন দিকে দৃষ্টি নেই। এই ক'মাসে সে আল্‌ভারেজকে সত্যিই ভালবেসেছিল, তার নির্ভীকতা, তার সঙ্কল্পে অটলতা, তার পরিশ্রম করবার অসাধারণ শক্তি, তার বীরত্ব—শঙ্করকে মুগ্ধ করেছিল। সে আল্‌ভারেজ্‌কে নিজের পিতার মত ভালবাসতো। আল্‌ভারেজ্‌ও তাকে তেমনি স্নেহের চোখেই দেখতো।

কিন্তু এসবের চেয়েও শঙ্করের মনে হচ্ছে বেশী যে, আল্‌ভারেজ মারা গেল শেষকালে সেই অজ্ঞাত জানোয়ারটারই হাতে। ঠিক জিম কার্টারের মতই।

রাত্রি গভীর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে তার মন ভয়ে আকুল হয়ে উঠল। সম্মুখে ভীষণ অজানা মৃত্যুদূত—ঘোর রহস্যময় তার অস্তিত্ব। কখন সে আসবে, কখন বা যাবে, কেউ তার সন্ধান দিতে পারবে না। ঘুমে ঢুলে না পড়ে, শঙ্কর মনের বলে জেগে বসে রইল সারারাত।

ওঃ সে কি ভীষণ রাত্রি ! যতদিন বেঁচে থাকবে, ততদিন এ রাত্রির কথা সে ভুলবে না। গাছে গাছে, ডালে ডালে হাজার ধারায় বৃষ্টি-পতনের শব্দে ও একটানা ঝড়ের শব্দে অরণ্যানীর অন্য সকল নৈশ শব্দকে আজ ডুবিয়ে দিয়েছে, পাহাড়ের ওপর বড় গাছ মড়মড় করে ভেঙে পড়ছে। এই ভয়ঙ্কর রাত্রিতে সে একা এই ভীষণ অরণ্যানীর মধ্যে ! কালো গাছের গুঁড়িগুলো যেন প্রেতের মত দেখাচ্ছে, অত বড় বৃষ্টিতেও জোনাকির ঝাঁক জ্বলছে। সম্মুখে বন্ধুর মৃতদেহ। ভয় পেলে চলবে না। সাহস আনতেই হবে মনে, নতুবা ভয়েই সে মারা যাবে। সাহস আনবার প্রাণপণ চেষ্টায় সে রাইফেল দুটির দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করলে। একটা উইনচেস্টার, অপরটি ম্যান্‌কিলার—দুটোরই ম্যাগাজিনে টোটা ভর্তি। এমন কোনো শরীর-ধারী জীব নেই, যে এই দুই শক্তিশালী অতি ভয়ানক মারণাস্ত্রকে উপেক্ষা করে আজ রাত্রে অক্ষতদেহে তাঁবুতে ঢুকতে পারে !

ভয় ও বিপদ মানুষকে সাহসী করে। শঙ্কর সারারাত সজাগ পাহারা দিল। পরদিন সকালে আল্‌ভারেজের মৃতদেহ সে একটা বড় গাছের তলায় সমাধিস্থ করলে এবং দু-খানা গাছের ডাল ক্রশের আকারে শক্ত লতা দিয়ে বেঁধে সমাধির ওপর তা পুঁতে দিলে।

আল্‌ভারেজের কাগজপত্রের মধ্যে ওপর্টো খনি-বিদ্যালয়ের একটা ডিপ্লোমা ছিল ওর নামে। তাদের শেষ পরীক্ষায় আল্‌ভারেজ সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছে। ওর কথাবার্তায় অনেক সময়ই শঙ্করের সন্দেহ হতো যে সে নিতান্ত মূর্খ, ভাগ্যান্বেষী, ভবঘুরে নয়।

লোকালয় থেকে বহুদূরে এই জনহীন, গহন অরণ্যে ক্লান্ত আল্‌ভারেজের রত্নানুসন্ধান শেষ হল। তার মত লোকেরা রত্নের কাঙাল নয়, বিপদের নেশায় পথে পথে ঘুরে বেড়ানোই তাদের জীবনের পরম আনন্দ, কুবেরের ভাণ্ডারও তাকে এক জায়গা চিরকাল আটকে রাখতে পারতো না।

দুঃসাহসিক ভবঘুরের উপযুক্ত সমাধি বটে। অরণ্যের বনস্পতিদল ছায়া দেবে সমাধির ওপর। সিংহ, গরিলা, হায়েনা সজাগ রাত্রি যাপন করবে, আর সবারই ওপরে সবাইকে ছাপিয়ে বিশাল রিখ্‌টারস্‌ভেল্ড পর্বতমালা অদূরে দাঁড়িয়ে মেঘলোকে মাথা তুলে খাড়া পাহারা রাখবে চিরযুগ।

দশ

সেদিন সে-রাত্রিও কেটে গেল। শঙ্কর এখন দুঃসাহসে মরীয়া হয়ে উঠেছে। যদি তাকে প্রাণ নিয়ে এ ভীষণ অরণ্য থেকে উদ্ধার পেতে হয়, তবে তাকে ভয় পেলে চলবে না। দু-দিন সে কোথাও না গিয়ে তাঁবুতে বসে মন স্থির করে ভাববার চেষ্টা করলে, সে এখন কি করবে। হঠাৎ তার মনে হল, আল্‌ভারেজের সেই কথাটা—সল্‌স্‌বেরি....এখান থেকে পূর্ব-দক্ষিণ কোণে আন্দাজ পাঁচ-ছশো মাইল....

সল্‌স্‌বেরি।....দক্ষিণ রোডেসিয়ার রাজধানী সল্‌স্‌বেরি। যে করে হোক, পৌঁছুতেই হবে তাকে সল্‌স্‌বেরিতে। সে এখনও অনেকদিন বাঁচবে, তার জন্মকোষ্ঠিতে লেখা আছে। এ জায়গায় বেঘোরে সে মরবে না।

* * * *

শঙ্কর ম্যাপগুলো খুব ভাল করে দেখলে। পর্তুগিজ গবর্নমেন্টের ফরেস্ট্ সার্ভের ম্যাপ, ১৮৭৩ সালের রয়েল মেরিন সার্ভের তৈরী উপকূলের ম্যাপ, ভ্রমণকারী স্যার ফিলিপো ডি ফিলিপির ম্যাপ, এ বাদে আল্‌ভারেজের হাতে আঁকা ও জিম কার্টারের সইযুক্ত একখানা জীর্ণ বিবর্ণ খসড়া নক্সা। আল্‌ভারেজ বেঁচে থাকতে সে এই সব ম্যাপ বুঝতে একবারও ভাল করে চেষ্টা করেনি, এখন এদের বোঝার ওপর তার জীবন-মরণ নির্ভর করছে। সল্‌স্‌বেরির সোজা রাস্তা বার করতে হবে। এ স্থান থেকে তার অবস্থিতি-বিন্দুর দিক্ নির্ণয় করতে হবে, রিখ্‌টারস্‌ভেল্ড অরণ্যের এক গোলকধাঁধা থেকে তাকে উদ্ধার পেতে হবে—সবই এই ম্যাপগুলির সাহায্যে।

অনেক দেখবার শোনবার পরে ও বুঝতে পারলে এই অরণ্য পর্বতমালার সম্বন্ধে কোনো ম্যাপেই বিশেষ কিছুই দেওয়া নেই—এক আল্‌ভারেজের ও জিম কার্টারের খসড়া ম্যাপখানা ছাড়া। তাও এত সংক্ষিপ্ত এবং তাতে এত সাঙ্কেতিক ও গুপ্তচিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে যে, শঙ্করের পক্ষে তা প্রায় দুর্বোধ্য। কারণ এদের সব সময়েই ভয় ছিল যে ম্যাপ অপরের হাতে পড়লে, পাছে আর কেউ এসে ওদের ধনে ভাগ বসায়।

চতুর্থ দিন শঙ্কর সে-স্থান ত্যাগ করে আন্দাজমত পুবদিকে রওনা হল। যাবার আগে কিছু বনের ফুলের মালা গেঁথে আল্‌ভারেজের সমাধির ওপর অর্পণ করলে।

বুশ ক্র্যাফট্' বলে একটা জিনিস আছে। সুবিস্তীর্ণ, বিজন, গহন অরণ্যানীর মধ্যে ভ্রমণ করবার সময়ে এ বিদ্যা জানা না থাকলে বিপদ অবশ্যম্ভাবী। আল্‌ভারেজের সঙ্গে এতদিন ঘোরাঘুরি করার ফলে শঙ্কর কিছু কিছু বুশ ক্র্যাফট্ শিখে নিয়েছিল, তবুও তার মনে সন্দেহ হল যে, এই বন একা পাড়ি দেবার যোগ্যতা সে কি অর্জন করেছে? শুধু ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে তাকে চলতে হবে, ভাগ্য ভাল হয় বন পার হতে পারে, ভাগ্য প্রসন্ন না হয়—মৃত্যু।

দুটো তিনটে ছোট পাহাড় সে পার হয়ে চলল। বন কখনো গভীর, কখনো পাতলা। কিন্তু বৃহৎ বৃহৎ বনস্পতির আর শেষ নেই। শঙ্করের জানা ছিল যে, দীর্ঘ এলিফ্যান্ট ঘাসের জঙ্গল এলে বুঝতে হবে যে বনের প্রান্তসীমা পৌঁছানো গিয়েছে। কারণ গভীর জঙ্গলে কখনো এলিফ্যান্ট বা টুসক্ ঘাস জন্মায় না। কিন্তু এলিফ্যান্ট ঘাসের চিহ্ন নেই কোনোদিকে—শুধুই বনস্পতি আর নীচু বনঝোপ।

প্রথম দিন শেষ হল এক নিবিড়তর অরণ্যের মধ্যে। শঙ্কর জিনিসপত্র প্রায় সবই ফেলে দিয়ে এসেছিল, কেবল আল্‌ভারেজের ম্যানকিলার রাইফেলটা, অনেকগুলো টোটা, জলের বোতল, টর্চ, ম্যাপগুলো, কম্পাস, ঘড়ি, একখানা কম্বল ও সামান্য কিছু ঔষধ সঙ্গে নিয়েছিল—আর নিয়েছিল একটা দড়ির দোলনা। তাঁবুটা যদিও খুব হালকা, কিন্তু তা সে বয়ে আনা অসম্ভব বিবেচনায় ফেলেই এসেছে।

দুটো গাছের ডালে মাটি থেকে অনেকটা উঁচুতে সে দড়ির দোলনা টাঙালে এবং হিংস্র জন্তুর ভয়ে গাছতলায় আগুন জ্বালালে। দোলনায় শুয়ে বন্দুক হাতে জেগে রইল, কারণ ঘুম অসম্ভব। একে ভয়ানক মশা, তার ওপর সন্ধ্যার পর থেকেই গাছতলার কিছুদূর দিয়ে একটা চিতাবাঘ যাতায়াত শুরু করলে। গভীর অন্ধকারে তার চোখ জ্বলে যেন দুটো আগুনের ভাঁটা, শঙ্কর টর্চের আলো ফেলে, পালিয়ে যায়, আবার আধঘণ্টা পরে ঠিক সেইখানে দাঁড়িয়ে ওর দিকে চেয়ে থাকে। শঙ্করের ভয় হল, ঘুমিয়ে পড়লে হয়তো বা লাফ দিয়ে দোলনায় উঠে আক্রমণ করবে। চিতাবাঘ অতি ধূর্ত জানোয়ার। কাজেই সারারাত্রি শঙ্কর চোখের পাতা বোজাতে পারলে না। তার ওপর চারিধারে নানা বন্য জন্তুর রব। একবার একটু তন্দ্রা এসেছিল, হঠাৎ কাছেই কোথাও একদল বালক-বালিকার খিল্‌খিল হাসির রবে তন্দ্রা ছুটে গিয়ে ও চমকে জেগে উঠল। ছেলেমেয়েরা হাসে কোথায় ? এই জনমানবহীন অরণ্যে বালক-বালিকাদের যাতায়াত করা বা এত রাত্রে হাসা উচিত নয় তো ? পরক্ষণেই তার মনে পড়ল একজাতীয় বেবুনের ডাক ঠিক ছেলেপুলের হাসির মত শোনায়, আল্‌ভারেজ একবার গল্প করেছিল। প্রভাতে সে গাছ থেকে নেমে রওনা হল। বৈমানিকেরা যাকে বলেন 'ফ্লাইং ব্লাইণ্ড'—সে

সেইভাবে বনের মধ্যে দিয়ে চলেছে, সম্পূর্ণ ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে, দু চোখ বুজে। এই দু-দিন চলেই সে সম্পূর্ণভাবে দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়েছে—আর তার উত্তর দক্ষিণ পুব পশ্চিম জ্ঞান নেই। সে বুঝলে কোনো মহারণ্যে দিক ঠিক রেখে চলা কি ভীষণ কঠিন ব্যাপার। তোমার চারিপাশে সব সময়েই গাছের গুঁড়ি, অগণিত, অজস্র, তার লেখাজোখা নেই। তোমার মাথার ওপর সব সময় ডালপালা লতাপাতায় চন্দ্রাতপ। নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য দৃষ্টিগোচর হয় না। সূর্যের আলোও কম, সব সময়েই যেন গোধূলি। ক্রোশের পর ক্রোশ যাও, ঐ একই ব্যাপার। এদিকে কম্পাস অকেজো, কি করে দিক ঠিক রাখা যায় ?

* * * *

পঞ্চম দিনে একটা পাহাড়ের তলায় এসে সে বিশ্রামের জন্যে থামল। কাছেই একটা প্রকাণ্ড গুহার মুখ, একটা ক্ষীণ জলস্রোত গুহার ভেতর থেকে বেরিয়ে বনের মধ্যে এঁকে বেঁকে অদৃশ্য হয়েছে।

অত বড় গুহা কখনো না দেখার দরুন, একটা কৌতূহলের বশবর্তী হয়েই সে জিনিসপত্র বাইরে রেখে গুহার মধ্যে ঢুকলো। গুহার মুখে খানিকটা আলো—ভেতরে বড় অন্ধকার, টর্চ জ্বেলে সন্তর্পণে অগ্রসর হয়ে সে ক্রমশঃ এমন এক জায়গায় এসে পৌঁছুলো, যেখানে ডাইনে বাঁয়ে আর দুটো মুখ। ওপরের দিকে টর্চ উঠিয়ে দেখলে, ছাদটা অনেকটা উঁচু। সাদা শক্ত নুনের মত ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের সরু মোটা ঝুরি ছাদ থেকে ঝাড়লণ্ঠনের মত ঝুলছে।

গুহার দেওয়ালগুলো ভিজে, গা বেয়ে অনেক জায়গায় জল খুব ক্ষীণ ধারায় ঝরে পড়ছে। শঙ্কর ডাইনের গুহায় ঢুকলো, সেটা ঢুকবার সময় সরু, কিন্তু ক্রমশঃ প্রশস্ত হয়ে গিয়েছে। পায়ে পাথর নয়, ভিজে মাটি। টর্চের আলোয় ওর মনে হল, গুহাটা ত্রিভুজাকৃতি। ত্রিভুজের ভূমির এক কোণে আর একটা গুহামুখ। সেটা দিয়ে ঢুকে শঙ্কর দেখলে সে যেন দু-ধারে পাথরের উঁচু দেওয়ালওয়ালা একটা সঙ্কীর্ণ গলির মধ্যে এসেছে। গলিটা আঁকা-বাঁকা, একবার ডাইনে একবার বাঁয়ে সাপের মত এঁকে-বেঁকে চলেছে—শঙ্কর অনেক দূর চলে গেল গলিটা ধরে।

ঘন্টা দুই এতে কাটলো। তার পর সে ভাবলে, এবার ফেরা যাক। কিন্তু ফিরতে গিয়ে সে আর কিছুতেই সেই ত্রিভুজাকৃতি গুহাটা খুঁজে পেল না। কেন, এই তো সেই গুহা থেকেই এই সরু গুহাটা বেরিয়েছে, সরু গুহা তো শেষ হয়েই গেল—তবে সে ত্রিভুজ গুহা কৈ ?

অনেকক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর শঙ্করের হঠাৎ কেমন আতঙ্ক উপস্থিত হল। সে গুহার পথ হারিয়ে ফেলেনি তো? সর্বনাশ !

সে বসে আতঙ্ক দূর করবার চেষ্টা করলে, ভাবলে—না, ভয় পেলে তার চলবে না। স্থির বুদ্ধি ভিন্ন এ বিপদ থেকে উদ্ধারের উপায় নেই। মনে পড়ল, আল্‌ভারেজ তাকে বলে দিয়েছিল, অপরিচিত স্থানে বেশীদূর অগ্রসর হবার সময়ে পথের পাশে সে যেন কোন চিহ্ন রেখে যায়, যাতে আবার সেই চিহ্ন ধরে ফিরতে পারে। এ উপদেশ সে ভুলে গিয়েছিল। এখন উপায় ?

টর্চের আলো জ্বালতে তার আর ভরসা হচ্ছে না। যদি ব্যাটারি ফুরিয়ে যায়, তবে নিরুপায় । গুহার মধ্যে অন্ধকার সূচীভেদ্য। সেই দুর্নিরীক্ষ্য অন্ধকারে এক পা অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। পথ খুঁজে বার করা তো দূরের কথা।

সারাদিন কেটে গেল—ঘড়িতে সন্ধ্যা সাতটা। এদিকে টর্চের আলো রাঙা হয়ে আসছে ক্রমশঃ। ভীষণ গুমট গরম গুহার মধ্যে, তা ছাড়া পানীয় জল নেই। পাথরের দেওয়াল বেয়ে যে জল চুঁয়ে পড়ছে, তার আস্বাদ—কষা, ক্ষার, ঈষৎ লোনা। তার পরিমাণও বেশী নয়। জিব দিয়ে চেটে খেতে হয় দেওয়ালের গা থেকে।

বাইরে অন্ধকার হয়েছে নিশ্চয়ই, সাড়ে সাতটা বাজলো। আটটা, ন'টা, দশটা। তখনও শঙ্কর পথ হাতড়াচ্ছে, টর্চের পুরোনো ব্যাটারি জ্বলছে সমানে বেলা তিনটে থেকে, এইবার সে এত ক্ষীণ হয়ে এসেছে যে শঙ্কর ভয়ে আরও উন্মাদের মত হয়ে উঠল। এই আলো যতক্ষণ, তার প্রাণের ভরসাও ততক্ষণ—নতুবা এ রৌরব নরকের মত মহা অন্ধকারে পথ খুঁজে পাবার কোনো আশা নেই—স্বয়ং আল্‌ভারেজও পারতো না।

টর্চ নিবিয়ে ও চুপ করে একখানা পাথরের ওপর বসে রইল। এ থেকে উদ্ধার পাওয়া যেতেও পারতো, যদি আলো থাকতো—কিন্তু অন্ধকারে সে কি করে এখন ? একবার ভাবলে, রাত্রিটা কাটুক না, দেখা যাবে এখন। পরক্ষণেই মনে হল—তাতে আর কি সুবিধে হবে ? এখানে দিন রাত্রি সমান।

অন্ধকারেই সে দেওয়াল ধরে ধরে চলতে লাগলো। হায়, হায়, কেন গুহায় ঢুকবার সময় দুটো নতুন ব্যাটারি সঙ্গে নেয়নি ! অন্ততঃ একটা দেশলাই !

ঘড়ি হিসেবে সকাল হল। গুহার চির অন্ধকারে আলো জ্বললো না। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় শরীর অবসন্ন হয়ে আসছে ওর। বোধ হয় এই গুহার অন্ধকারে ওর সমাধি অদৃষ্টে লেখা আছে, দিনের আলো আর দেখতে হবে না। আল্‌ভারেজের বলি গ্রহণ করে আফ্রিকার রক্ততৃষ্ণা মেটেনি, তাকেও চাই।

তিন দিন তিন রাত্রি কেটে গেল। শঙ্কর জুতোর শুকতোলা চিবিয়ে খেয়েছে, একটা আরসুলা কি ইঁদুর, কি কাঁকড়াবিছে—কোনো জীব নেই গুহার মধ্যে যে সে ধরে খায়। মাথা ক্রমশঃ অপ্রকৃতিস্থ হয়ে আসছে, তার জ্ঞান নেই সে কি করছে বা তার কি ঘটছে—কেবল এইটুকু মাত্র জ্ঞান রয়েছে যে তাকে এ গুহা থেকে যে করে হোক বেরুতেই হবে, দিনের আলোর মুখ দেখতেই হবে। তাই সে অবসন্ন নির্জীব দেহেও অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়েই বেড়াচ্ছে, হয়তো মরণের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত ওইরকমই হাতড়াবে।

একবার সে অবসন্ন দেহে ঘুমিয়ে পড়ল। কতক্ষণ পরে সে জেগে উঠল তা সে জানে না ; দিন, রাত্রি, ঘণ্টা, ঘড়ি, দণ্ড, পল মুছে গিয়েছে এই ঘোর অন্ধকারে। হয়তো বা তার চোখ দৃষ্টিহীন হয়ে পড়েছে, কে জানে ?

ঘুমোবার পরে সে যেন একটু বল পেল। আবার উঠল, আবার চলল, আল্‌ভারেজের শিষ্য সে, নিশ্চেষ্ট ভাবে হাত-পা কোলে করে বসে কখনই মরবে না।....সে পথ খুঁজবে, খুঁজবে, যতক্ষণ বেঁচে আছে।

আশ্চর্য, সে নদীটাই বা কোথায় গেল ?....গুহার মধ্যে গোলকধাঁধায় ঘোরবার সময়ে জলধারাকে সে কোথায় হারিয়ে ফেলেছে। নদী দেখতে পেলে হয়তো উদ্ধার পাওয়াও যেতে পারে, কারণ তার এক মুখ যেদিকেই থাক, একটা মুখ আছে গুহার বাইরে। কিন্তু নদী তো দূরের কথা, একটা অতি ক্ষীণ জলধারার সঙ্গেও আজ তিনদিন পরিচয় নেই। জল অভাবে শঙ্কর মরতে বসেছে, কষা, লোনা, বিস্বাদ জল চেটে চেটে তার জিব ফুলে উঠেছে, তৃষ্ণা তাতে বেড়েছে ছাড়া কমেনি।

পাথরের দেওয়াল হাতড়ে শঙ্কর খুঁজতে লাগল, ভিজে দেওয়ালের গায়ে কোথাও শেওলা জন্মেছে কি না—খেয়ে প্রাণ বাঁচাবে। না, তাও নেই ! পাথরের দেওয়াল সর্বত্র অনাবৃত—মাঝে মাঝে ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের পাতলা সর পড়েছে, একটা ব্যাঙের ছাতা, কি শেওলা-জাতীয় উদ্ভিদও নেই। সূর্যের আলোর অভাবে উদ্ভিদ এখানে বাঁচতে পারে না।

আরও একদিন কেটে রাত এল। এত ঘোরাঘুরি করেও কিছু সুবিধে হচ্ছে বলে তো বোধ হয় না। ওর মনে হতাশা ঘনিয়ে এসেছে। আরও সে কি চলবে, কতক্ষণ চলবে ? এতে কোনো ফল নেই, এ চলার শেষ নেই। কোথায় সে চলেছে এই গাঢ় নিকষকৃষ্ণ অন্ধকারে, এই ভয়ানক নিস্তব্ধতার মধ্যে ! উঃ, কি ভয়ানক অন্ধকার, আর কি ভয়ানক নিস্তব্ধতা ! পৃথিবী যেন মরে গিয়েছে, সৃষ্টিশেষের প্রলয়ে সোমসূর্য নিভে গিয়েছে, সেই মৃত পৃথিবীর জনহীন, শব্দহীন, সময়হীন শ্মশানে সে-ই একমাত্র প্রাণী বেঁচে আছে।

আর বেশীক্ষণ এ-রকম থাকলে সে ঠিক পাগল হয়ে যাবে।

এগারো

শঙ্কর একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল বোধ হয়, কিম্বা হয়তো অজ্ঞান হয়েই পড়ে থাকবে। মোটের ওপর যখন আবার জ্ঞান ফিরে এল, তখন ঘড়িতে রাত বারোটা—সম্ভবতঃ রাত বারোটাই হবে। ও উঠে আবার চলতে শুরু করলে। এক জায়গায় তার সামনে একটা পাথরের দেওয়াল পড়ল—তার রাস্তা যেন আটকে রেখেছে। টর্চের রাঙা আলো একটিবার মাত্র জ্বালিয়ে সে দেখলে, যে দেওয়াল ধরে সে এতক্ষণ যাচ্ছিল, তারই সঙ্গে সমকোণ করে এ দেওয়ালটা আড়াআড়ি ভাবে তার পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে।

হঠাৎ সে কান খাড়া করলে....অন্ধকারের মধ্যে কোথায় যেন ক্ষীণ জলের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না ?....

হ্যাঁ ঠিক, জলের শব্দই বটে... কুলু, কুলু, কুলু, কুলু ঝরনা-ধারার শব্দ—যেন পাথরের নুড়ির ওপর দিয়ে মাঝে মাঝে বেধে জল বইছে কোথাও। ভাল করে শুনে ওর মনে হল, জলের শব্দটা হচ্ছে এই পাথরের দেওয়ালের ওপারে। দেওয়ালে কান পেতে শুনে ওর সে ধারণা আরও বদ্ধমূল হল। দেওয়াল ফুঁড়ে যাবার উপযুক্ত ফাঁক আছে কিনা, টর্চের রাঙা আলোয় সন্ধান করতে করতে এক জায়গায় খুব নীচু ও সংকীর্ণ প্রাকৃতিক রন্ধ্র দেখতে পেলে। সেখান দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে অনেকটা গিয়ে হাতে জল ঠেকলো। সন্তর্পণে ওপরের দিকে হাত দিয়ে বুঝলো, সেখানটাতে দাঁড়ানো যেতে পারে। দাঁড়িয়ে উঠে ঘন অন্ধকারের মধ্যে কয়েক পা যেতেই স্রোতযুক্ত বরফের মত ঠান্ডা জলে পায়ের পাতা ডুবে গেল ।.....

ঘন অন্ধকারের মধ্যেই নীচু হয়ে ও প্রাণভরে ঠান্ডা জল পান করে নিলে। তার পর টর্চের ক্ষীণ আলোয় জলের স্রোতের গতি লক্ষ্য করলে। এ ধরনের নির্ঝরের স্রোতের উজান দিকে গুহার মুখ সাধারণতঃ হয় না। টর্চ নিবিয়ে সেই মহা নিবিড় অন্ধকারে পায়ে পায়ে জলের ধারা অনুভব করতে করতে অনেকক্ষণ ধরে চললো। নির্ঝর চলেছে এঁকে-বেঁকে, কখনও ডাইনে, কখনও বাঁয়ে। এক জায়গায় যেন সেটা তিন-চারটে ছোট বড় ধারায় বিভক্ত হয়ে গিয়ে এদিক ওদিক চলে গিয়েছে, ওর মনে হল।

সেখানে এসে সে দিশাহারা হয়ে পড়ল। টর্চ জ্বেলে দেখলে স্রোত নানামুখী। আল্‌ভারেজের কথা মনে পড়ল, পথে চিহ্ন রেখে না গেলে এখানে আবার গোল পাকিয়ে যাবার সম্ভাবনা।

নীচু হয়ে চিহ্ন রেখে যাওয়ার উপযোগী কিছু খুঁজতে গিয়ে দেখলে, স্বচ্ছ নির্মল জলধারার এপারে ওপারে দু-পারেই এক ধরনের পাথরের নুড়ি বিস্তর পড়ে আছে। সেই ধরনের পাথরের নুড়ির ওপর দিয়েও প্রধান জলধারা বয়ে চলেছে।

অনেকগুলো নুড়ি পকেটে নিয়ে, সে প্রত্যেক শাখাটা শেষ পর্যন্ত পরীক্ষা করবে ভেবে, দুটো নুড়ি ধারার পাশে রাখতে রাখতে গেল। একটা স্রোত থেকে খনিকদূর গিয়ে আবার অনেকগুলো ফেক্‌ড়ি বেরিয়েছে। প্রত্যেক সংযোগস্থলে ও নুড়ি সাজিয়ে একটা 'S' অক্ষর তৈরী করে রাখলে।

অনেকগুলো স্রোতশাখা আবার ঘুরে শঙ্কর যেদিক থেকে এসেছিল, সেদিকেই যেন ঘুরে গেল। পথে চিহ্ন না রেখে গিয়েই শঙ্করের মাথা গোলমাল হয়ে যাবার যোগাড় হল। একবার শঙ্করের পায়ে খুব ঠান্ডা কি ঠেকতেই সে আলো জ্বেলে দেখলে, জলের ধারে এক প্রকাণ্ডকায় অজগর পাইথন কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে। পাইথন ওর স্পর্শে আলস্য পরিত্যাগ করে মাথাটা উঠিয়ে কড়ির দানার মত চোখে চাইতেই টর্চের আলোয় দিশাহারা হয়ে গেল—নতুবা শঙ্করের প্রাণসংশয় হয়ে উঠতো। শঙ্কর জানে অজগর সর্প অতি ভয়ানক জন্তু—বাঘ সিংহের মুখ থেকেও হয়তো পরিত্রাণ পাওয়া যেতে পারে, অজগর সর্পের নাগপাশ থেকে উদ্ধার পাওয়া অসম্ভব। একটিবার লেজ ছুঁড়ে পা জড়িয়ে ধরলে আর দেখতে হতো না।

এবার অন্ধকারে চলতে ওর ভয়ানক ভয় করছিল। কি জানি, আবার কোথায় কোন্ পাইথন সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে। দুটো তিনটে স্রোতশাখা পরীক্ষা করে দেখবার পরে ও তার কৃত চিহ্নের সাহায্যে পুনরায় সংযোগস্থলে ফিরে এল। প্রধান সংযোগস্থলে ও নুড়ি দিয়ে একটা ক্রুশচিহ্ন করে রেখে গিয়েছিল। এবার ওরই মধ্যে যেটাকে প্রধান বলে মনে হল, সেটা ধরে চলতে গিয়ে দেখলে সেও সোজামুখে যায়নি। তারও নানা ফেঁক্‌ড়ি বেরিয়েছে কিছুদূরে গিয়েই। এক-এক জায়গায় গুহার ছাদ এত নীচু হয়ে নেমে এসেছে যে কুঁজো হয়ে, কোথাও বা মাজা দুমড়ে অশীতিপর বৃদ্ধের ভঙ্গিতে চলতে হয়।

হঠাৎ এক জায়গায় টর্চ জ্বেলে সেই অতি ক্ষীণ আলোতেও শঙ্কর বুঝতে পারলে, গুহাটা সেখানে ত্রিভুজাকৃতি—সেই ত্রিভুজ গুহা, যাকে খুঁজে বার না করতে পেরে মৃত্যুর দ্বার পর্যন্ত যেতে হয়েছিল। একটু পরেই দেখলে বহুদূরে যেন অন্ধকারের ফ্রেমে আঁটা কয়েকটি নক্ষত্র জ্বলছে। গুহার মুখ ! এবার আর ভয় নেই। এ-যাত্রার মত সে বেঁচে গেল ।

শঙ্কর যখন বাইরে এসে দাঁড়াল, তখন রাত তিনটে। সেখানটায় গাছপালা কিছু কম, মাথার ওপর নক্ষত্রভরা আকাশ দেখা যায়। রৌরবের মহা অন্ধকার থেকে বার হয়ে এসে রাত্রের নক্ষত্রালোকিত স্বচ্ছ

অন্ধকার তার কাছে দীপালোকখচিত নগরপথের মত মনে হল। প্রাণভরে সে ভগবানকে ধন্যবাদ দিলে এ অপ্রত্যাশিত মুক্তির জন্যে।

ভোর হল। সূর্যের আলো গাছের ডালে ডালে ফুটলো। শঙ্কর ভাবলে এ অমঙ্গলজনক স্থানে আর একদণ্ডও সে থাকবে না। পকেটে একখানা পাথরের নুড়ি তখনও ছিল, ফেলে না দিয়ে গুহার বিপদের স্মারক স্বরূপ সেখানা সে কাছে রেখে দিলে।

পরদিন এলিফান্ট ঘাস দেখা গেল বনের মধ্যে, সেদিনই সন্ধ্যার পূর্বে অরণ্য শেষ হয়ে খোলা জায়গা দেখা দিল। রাত্রে শঙ্কর অনেকক্ষণ বসে ম্যাপ দেখলে। সামনে যে মুক্ত প্রান্তরবৎ দেশ পড়ল, এখান থেকে এটা প্রায় তিনশো মাইল বিস্তৃত, একেবারে জাম্বেসী নদীর তীর পর্যন্ত। এই তিনশো মাইলের খানিকটা পড়েছে বিখ্যাত কালাহারি মরুভূমির মধ্যে, প্রায় ১৭৫ মাইল, অতি ভীষণ জনমানবহীন, জলহীন, পথহীন মরুভূমি। মিলিটারি ম্যাপ থেকে আল্‌ভারেজ নোট করেছে যে, এই অঞ্চলের উত্তরপূর্ব কোণ লক্ষ্য করে একটি বিশেষ পথ ধরে না গেলে, মাঝামাঝি পার হতে যাওয়ার মানেই মৃত্যু। ম্যাপে এর নাম দিয়েছে তৃষ্ণার দেশ' (Thirstland Trek)। রোডেসিয়া পৌঁছুতে পারলে যাওয়া অনেকটা সহজ হয়ে উঠবে, কারণ সে-সব স্থানে মানুষ আছে।

শঙ্কর এখানে অত্যন্ত সাহসের পরিচয় দিলে। পথের এই ভয়ানক অবস্থা জেনে-শুনেও সে দমে গেল না, হাত-পা-হারা হয়ে পড়ল না। এই পথে আল্‌ভারেজ একা গিয়ে সল্‌স্‌বেরি থেকে টোটা ও খাবার কিনে আনবে বলেছিল। বাষট্টি বছরের বৃদ্ধ যা পারবে বলে স্থির করেছিল, সে তা থেকে পিছিয়ে যাবে ?

কিন্তু সাহস ও নির্ভীকতা এক জিনিস, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ অন্য জিনিস। ম্যাপ দেখে গন্তব্যস্থানের দিকনির্ণয় করার ক্ষমতা শঙ্করের ছিল না। সে দেখলে ম্যাপের সে কিছুই বোঝে না। মিলিটারি ম্যাপগুলোতে দুটো মরুমধ্যস্থ কূপের অবস্থান-স্থানের ল্যাটিচিউড্ লঙ্গিচিউড্ দেওয়া আছে, 'ম্যাগনেটিক্ নর্থ' আর 'ট্রু নর্থ' ঘটিত কি একটা গোলমালে অঙ্ক কষে বার করতো আল্‌ভারেজ, শঙ্কর দেখেছে কিন্তু শিখে নেয়নি।

সুতরাং অদৃষ্টের উপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় কি ? অদৃষ্টের উপর নির্ভর করেই শঙ্কর এই দুস্তর মরুভূমিতে পাড়ি দিতে প্রস্তুত হল। ফলে দু'দিন যেতে না যেতেই শঙ্কর সম্পূর্ণ দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়ল। ম্যাপ দৃষ্টে যে কোনো অভিজ্ঞ লোক যে জলাশয় চোখ বুজে খুঁজে বার করতে পারতো—শঙ্কর তার তিন মাইল উত্তর দিয়ে চলে গেল, অথচ তখন তার জল ফুরিয়ে এসেছে, নতুন পানীয় জল সংগ্রহ করে না নিলে জীবন বিপদাপন্ন হবে।

প্রথমতঃ শুধু প্রান্তর আর পাহাড়, ক্যাক্‌টাস্ ও ইউফোর্বিয়ার বন, মাঝে মাঝে গ্রানাইটের স্তূপ। তার পর কি ভীষণ কষ্টের সে পথ-চলা ! খাদ্য নেই, জল নেই, পথ ঠিক নেই, মানুষের মুখ দেখা নেই। দিনের পর দিন শুধু সুদূর, শূন্য দিগ্বলয় লক্ষ্য করে সে হতাশ পথযাত্রা—মাথার ওপর আগুনের মত সূর্য, পায়ের নীচে বালি পাথর যেন জ্বলন্ত অঙ্গার, সূর্য উঠছে, অস্ত যাচ্ছে—নক্ষত্র উঠছে, চাঁদ উঠছে—আবার অস্ত যাচ্ছে। মরুভূমির গিরগিটি একঘেয়ে সুরে ডাকছে, ঝিঁঝিঁ ডাকছে—সন্ধ্যায়, গভীর নিশীথে।

মাইল-লেখা পাথর নেই, কত মাইল অতিক্রম করা হল তার হিসেব নেই। খাদ্য দু-একটা পাখী, কখনো বা মরুভূমির বুজার্ড শকুনি, যার মাংস জঠুর ও বিস্বাদ। এমন কি একদিন একটা পাহাড়ী বিষাক্ত কাঁকড়া বিছে, যার দংশনে মৃত্যু—তাও যেন পরম সুখাদ্য, মিললে মহা সৌভাগ্য।

দু'দিন ঘোর তৃষ্ণায় কষ্ট পাবার পরে পাহাড়ের ফাটলে একটা জলাশয় পাওয়া গেল। কিন্তু জলের চেহারা লাল, কতকগুলো কি পোকা ভাসছে জলে—ডাঙায় একটা কি জন্তু মরে পচে ঢোল হয়ে আছে। সেই জলই আকণ্ঠ পান করে শঙ্কর প্রাণ বাঁচালে।

দিনের পর দিন কাটছে—মাস গেল কি সপ্তাহ গেল কি বছর গেল, হিসেব নেই। শঙ্কর রোগা হয়ে গিয়েছে শুকিয়ে। কোথায় চলেছে তার কিছু ঠিক নেই—শুধু সামনের দিকে যেতে হবে এই জানে। সামনের দিকেই ভারতবর্ষ-বাংলাদেশ।

তার পর পড়ল আসল মরু, কালাহারি মরুভূমির এক অংশ। দূর থেকে তার চেহারা দেখে শঙ্কর ভয়ে শিউরে উঠলো। মানুষে কি করে পার হতে পারে এই অগ্নিদগ্ধ প্রান্তর। শুধুই বালির পাহাড়, তাম্রাভ ক'টা বালির সমুদ্র। ধূ ধূ করে যেন জ্বলছে দুপুরের রোদে। মরুর কিনারায় প্রথম দিনেই ছায়ায় ১২৭ ডিগ্রী উত্তাপ উঠল থার্মোমিটারে।

ম্যাপে বার বার লিখে দিয়েছে, উত্তর-পূর্ব কোণ ঘেঁষে ছাড়া কেউ এই মরুভূমি মাঝামাঝি পার হতে যাবে না। গেলেই মৃত্যু, কারণ সেখানে জল একদম নেই। জল যে উত্তরপূর্ব ধারে আছে তাও নয়, তবে ত্রিশ মাইল, সত্তর মাইল ও নব্বুই মাইল ব্যবধানে তিনটি স্বাভাবিক উণুই আছে—যাতে জল পাওয়া যায়। ঐ উণুইগুলি প্রায়ই পাহাড়ের ফাটলে, খুঁজে বার করা বড়ই কঠিন। এইজন্যে মিলিটারি ম্যাপে ওদের অবস্থান-স্থানের অক্ষ ও দ্রাঘিমা দেওয়া আছে।

শঙ্কর ভাবলে, ওসব বার করতে পারবো না। সেক্সটান্ট আছে, নক্ষত্রের চার্ট আছে কিন্তু তাদের ব্যবহার সে জানে না। যা হয় হবে, ভগবান ভরসা। তবে যতদূর সম্ভব উত্তর-পূর্ব কোণ ঘেঁষে যাবার চেষ্টা সে করলে।

তৃতীয় দিনে নিতান্ত দৈববলে সে একটা উণুই দেখতে পেল। জল কাদাগোলা, আগুনের মত গরম, কিন্তু তাই তখন অমৃতের মত দুর্লভ। মরুভূমি ক্রমে ঘোরতর হয়ে উঠল। কোন প্রকার জীবের বা উদ্ভিদের চিহ্ন ক্রমশঃ লুপ্ত হয়ে গেল। আগে রাত্রে আলো জ্বাললে দু-একটা কীটপতঙ্গ আলোয় আকৃষ্ট হয়ে আসতো, ক্রমে তাও আর আসে না।

দিনে উত্তাপ যেমন ভীষণ, রাত্রে তেমনি শীত। শেষ রাত্রে শীতে হাত-পা জমে যায় এমন অবস্থা, অথচ ক্রমশঃ আগুন জ্বালবার উপায় গেল, কারণ জ্বালানি কাঠ একেবারেই নেই। কয়েক দিনের মধ্যে সঞ্চিত জল গেল ফুরিয়ে। সেই সুবিস্তীর্ণ বালুকা-সমুদ্রে একটি পরিচিত বালুকণা খুঁজে বার করা যতদূর অসম্ভব, তার চেয়ে অসম্ভব ক্ষুদ্র এক হাত-দুই ব্যাসবিশিষ্ট জলের উণুই বার করা।

সেদিন সন্ধ্যার সময় তৃষ্ণার কষ্টে শঙ্কর উন্মত্তপ্রায় হয়ে উঠল। এতক্ষণে শঙ্কর বুঝেছে যে, এ ভীষণ মরুভূমি একা পার হওয়ার চেষ্টা করা আত্মহত্যার শামিল। সে এমন জায়গায় এসে পড়েছে, যেখান থেকে ফেরবার উপায়ও নেই।

একটা উঁচু বালিয়াড়ির ওপর উঠে সে দেখলে, চারিধারে শুধুই ক'টা বালির পাহাড়, পূর্বদিকে ক্রমশঃ উঁচু হয়ে গিয়েছে। পশ্চিমে সূর্য ডুবে গেলেও সারা আকাশ সূর্যাস্তের আভায় লাল। কিছুদূরে একটা ছোট ঢিবির মত পাহাড় এবং দূর থেকে মনে হল একটা গুহাও আছে।

এ ধরনের গ্রানাইটের ছোট ঢিবি এদেশে সর্বত্র—ট্রান্সভাল ও রোডেসিয়ায় এদের নাম 'Kopje' অর্থাৎ ক্ষুদ্র পাহাড়। রাত্রে শীতের হাত থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে শঙ্কর সেই গুহায় আশ্রয় নিলে।

এইখানে এক ব্যাপার ঘটল।

বারো

গুহার মধ্যে ঢুকে শঙ্কর টর্চ জ্বেলে (নতুন ব্যাটারি তার কাছে তখনও ডজন-দুই ছিল) দেখলে গুহাটা ছোট, মেজেটাতে ছোট ছোট পাথর ছড়ানো, বেশ একটা ছোটখাটো ঘরের মত। গুহার এক কোণে ওর চোখ পড়তেই অবাক হয়ে রইল। একটা ছোট্ট কাঠের পিপে ! এখানে কি করে এল কাঠের পিপে !

এগিয়ে দু-পা গিয়েই চমকে উঠল। গুহার দেওয়ালের ধার ঘেঁষে শায়িত অবস্থায় একটা সাদা নরকঙ্কাল, তার মুণ্ডটা দেওয়ালের দিকে ফেরানো। কঙ্কালের আশেপাশে কালো কালো থলে-ছেঁড়ার মত জিনিস, বোধ হয় সেগুলো পশমের কোটের অংশ। দু'খানা বুট জুতো কঙ্কালের পায়ে এখনও লাগানো। একপাশে একটা মরচে-পড়া বন্দুক।

পিপেটার পাশে একটা ছিপি-আঁটা বোতল। বোতলের মধ্যে একখানা কাগজ। ছিপিটা খুলে কাগজখানা বার করে দেখলে, তাতে ইংরিজিতে কি লেখা আছে।

পিপেটাতে কি আছে দেখবার জন্যে যেমন সে সেটা নাড়াতে গিয়েছে, অমনি পিপের নীচে থেকে একটা ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দ শুনে ওর শরীরের রক্ত ঠান্ডা হয়ে গেল। নিমেষের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড সাপ মাটি থেকে হাত তিনেক উঁচু হয়ে ঠেলে উঠল। বোধ হয় ছোবল মারবার আগে সাপটা এক সেকেণ্ড দেরি করেছিল। সেই এক সেকেণ্ডের দেরি করার জন্যে শঙ্করের প্রাণ রক্ষা হল। পরমুহূর্তেই শঙ্করের .৪৫ অটোমেটিক কোল্ট্ গর্জন করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে অতবড় ভীষণ বিষধর 'স্যান্ড্ ভাইপার'-এর মাথাটা ছিন্নভিন্ন হয়ে রক্ত-মাংস খানিকটা পিপের গায়ে, খানিকটা পাথরের দেওয়ালে ছিটকে লাগল। আল্‌ভারেজ ওকে শিখিয়েছিল, পথে সর্বদা হাতিয়ার তৈরী রাখবে। এ উপদেশ অনেকবার তার প্রাণ বাঁচিয়েছে।

অদ্ভুত পরিত্রাণ ! সব দিক থেকে। পিপেটা পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখা গেল, সেটাতে অল্প একটু জল তখনও আছে। খুব কালো শিউ গোলার মত রং বটে, তবুও জল। ছোট পিপেটা উঁচু করে ধরে, পিপের ছিপি খুলে ঢক্‌ঢক্ করে শঙ্কর সেই দুর্গন্ধ কালো কালির মত জল আকণ্ঠ পান করলে। তারপর সে টর্চের আলোতে সাপটা পরীক্ষা করলে। পুরো পাঁচ হাত লম্বা সাপটা, মোটাও বেশ। এ ধরণের সাপ মরুভূমির বালির মধ্যে লুকিয়ে শুধু মুণ্ডটা ওপরে তুলে থাকে—অতি মারাত্মক রকমের বিষাক্ত সর্প !

এইবার বোতলের মধ্যের কাগজখানা খুলে মন দিয়ে পড়লে। যে ছোট পেন্সিল দিয়ে এটা লেখা হয়েছে—বোতলের মধ্যে সেটাও পাওয়া গেল। কাগজখানাতে লেখা আছে....

আমার মৃত্যু নিকট। আজই আমার শেষ রাত্রি । যদি আমার মরণের পরে কেউ এই ভয়ঙ্কর মরুভূমির পথে যেতে যেতে এই গুহাতে আশ্রয় গ্রহণ করেন, তবে সম্ভবতঃ এই কাগজ তাঁর হাতে পড়বে।

আমার গাধাটা দিন দুই আগে মরুভূমির মধ্যে মারা গিয়েছে। একপিপে জল তার পিঠে ছিল, সেটা আমি এই গুহার মধ্যে নিয়ে এসে রেখে দিয়েছি, যদিও জ্বরে আমার শরীর অবসন্ন। মাথা তুলবার শক্তি নেই। তার ওপর অনাহারে শরীর আগের থেকেই দুর্বল।

আমার বয়স ২৬ বৎসর। আমার নাম আত্তিলিও গাত্তি। ফ্লোরেন্সের গাত্তি বংশে আমার জন্ম। বিখ্যাত নাবিক রিওলিনো কাভালকান্তি গাত্তি—যিনি লেপান্টোর যুদ্ধে তুর্কীদের সঙ্গে লড়েছিলেন, তিনি আমার একজন পূর্বপুরুষ।

রোম ও পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা লাভ করেছিলাম, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভবঘুরে হয়ে গেলাম সমুদ্রের নেশায়,—যা আমাদের বংশগত নেশা।

ডাচ্ ইণ্ডিজ্ যাবার পথে পশ্চিম আফ্রিকার উপকূলে জাহাজ-ডুবি হল।

আমরা সাতজন লোক অতিকষ্টে ডাঙা পেলাম। ঘোর জঙ্গলময় অঞ্চল আফ্রিকার এই পশ্চিম উপকূল ! জঙ্গলের মধ্যে শেফুজাতির এক গ্রামে আমরা আশ্রয় নিই এবং প্রায় দু-মাস সেখানে থাকি। এখানেই দৈবাৎ এক অদ্ভুত হীরার খনির গল্প শুনলাম। পূর্বদিকে এক প্রকাণ্ড পর্বত ও ভীষণ আরণ্য অঞ্চলে নাকি এই হীরার খনি অবস্থিত।

আমরা সাতজন ঠিক করলাম এই হীরার খনি যে করে হোক বার করতে হবেই। আমাকে ওরা দলের অধিনায়ক করলে—তার পর আমরা দুর্গম জঙ্গল ঠেলে চললাম সেই সম্পূর্ণ অজ্ঞাত পার্বত্য অঞ্চলে। সে গ্রামের কোন লোক পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে রাজী হল না। তারা বলে, তারা কখনও সে জায়গায় যায়নি, কোথায় তা জানে না, বিশেষতঃ এক উপদেবতা নাকি সে বনের রক্ষক। সেখান থেকে হীরা নিয়ে কেউ আসতে পারবে না।

আমরা দমবার পাত্র নই। পথে যেতে যেতে ঘোর কষ্টে বেঘোরে দুজন সঙ্গী মারা গেল। বাকী চারজন আর অগ্রসর হতে চায় না। আমি দলের অধ্যক্ষ, গাত্তি বংশে আমার জন্ম, পিছু হটতে জানি না। যতক্ষণ প্রাণ আছে, এগিয়ে যেতে হবে এই জানি। আমি ফিরতে চাইলাম না।

শরীর ভেঙে পড়তে চাইছে। আজ রাত্রেই আসবে সে নিরবয়ব মৃত্যুদূত। বড় সুন্দর আমাদের ছোট্ট হ্রদ সেরিনো লাগ্রানো, ওরই তীরে আমার পৈতৃক প্রাসাদ কাস্টোলি রিওলিনি। এতদূর থেকেও আমি সেরিনো লাগ্রানোর তীরবর্তী কমলালেবুর বাগানের লেবুফুলের সুগন্ধ পাচ্ছি। ছোট যে গির্জাটি পাহাড়ের নীচেই, তার রুপোর ঘণ্টার মিষ্টি আওয়াজ পাচ্ছি।

না, এসব কি আবোল-তাবোল লিখছি জ্বরের ঘোরে। আসল কথাটা বলি। কতক্ষণই বা আর লিখবো ?

আমরা সে পর্বতমালা, সে মহাদুর্গম অরণ্যে গিয়েছিলাম। সে খনি বার করেছিলাম। যে নদীর তীরে হীরা পাওয়া যায়, এক বিশাল ও অতি ভয়ানক গুহার মধ্যে সে নদীর উৎপত্তি স্থান। আমিই সেই গুহার মধ্যে ঢুকে এবং নদীর জলের তীরে ও জলের মধ্যে পাথরের নুড়ির মত অজস্র হীরা ছড়ানো দেখতে পাই। প্রত্যেক নুড়িটি টেট্রাহেড্রন ক্রিস্ট্যাল, স্বচ্ছ ও হরিদ্রাভ ; লণ্ডন ও আমস্টার্ডামের বাজারে এমন হীরা নেই।

এই অরণ্য ও পর্বতের সে উপদেবতাকে আমি এই গুহার মধ্যে দেখেছি—ধুনোর কাঠের মশালের আলোয় দূর থেকে আবছায়া ভাবে। সত্যিই ভীষণ তার চেহারা ! জ্বলন্ত মশাল হাতে ছিল বলেই সেদিন আমার কাছে সে ঘেঁষেনি। এই গুহাতেই সে সম্ভবতঃ বাস করে। হীরার খনির সে রক্ষক, এই প্রবাদের সৃষ্টি সেই জন্যেই বোধ হয় হয়েছে।

কিন্তু কি কুক্ষণেই হীরার সন্ধান পেয়েছিলাম এবং কি কুক্ষণেই সঙ্গীদের কাছে তা প্রকাশ করেছিলাম। ওদের নিয়ে আবার যখন সে গুহায় ঢুকি, হীরার খনি খুঁজে পেলাম না। একে ঘোর অন্ধকার, মশালের আলোয় সে অন্ধকার দূর হয় না, তার ওপরে বহুমুখী নদী, কোন্ স্রোতটার ধারা হীরার রাশির ওপর দিয়ে বইছে, কিছুতেই বার করতে পারলাম না আর।

আমার সঙ্গীরা বর্বর, জাহাজের খালাসী। ভাবলে, ওদের ফাঁকি দিলাম বুঝি । আমি একা নেবো এই বুঝি আমার মতলব। ওরা কি ষড়যন্ত্র আঁটলে জানি নে, পরদিন সন্ধ্যাবেলা চারজনে মিলে অতর্কিতে ছুরি খুলে আমায় আক্রমণ করলে। কিন্তু তারা জানতো না আমাকে, আত্তিলিও গাত্তিকে। আমার ধমনীতে উষ্ণ রক্ত বইছে আমার পূর্বপুরুষ রিওলিনি কাভালকান্তি গাত্তির, যিনি লেপান্টোর যুদ্ধে ওরকম বহু বর্বরকে নরকে পাঠিয়েছিলেন। সান্টা কাটালিনার সামরিক বিদ্যালয়ে যখন আমি ছাত্র, আমাদের অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ Fencer এন্টোনিও ড্রেফুস্‌কে ছোরার ডুয়েলে জখম করি। আমার ছোরার আঘাতে ওরা দুজন মরে গেল, দুজন সাংঘাতিক ঘায়েল হল, নিজেও আমি চোট পেলাম ওদের হাতে। আহত বদমাইশ দুটোও সেই রাত্রেই ভবলীলা শেষ করল। ভেবে দেখলাম এখন এই গুহার গোলকধাঁধার ভেতর থেকে খনি খুঁজে হয়তো বার করতে পারবো না। তা ছাড়া আমি সাংঘাতিক আহত, আমায় সভ্যজগতে পৌছুতেই হবে। পূর্বদিকের পথে ডাচ্ উপনিবেশে পৌঁছুবো বলে রওনা হয়েছিলুম। কিন্তু এ পর্যন্ত এসে আর অগ্রসর হতে পারলুম না। ওরা তলপেটে ছুরি মেরেছে, সেই ক্ষতস্থান উঠল বিষিয়ে। সেই সঙ্গে জ্বর। মানুষের কি লোভ তাই ভাবি। কেন ওরা আমাকে মারলে ? ওরা আমার সঙ্গী, একবারও তো ওদের ফাঁকি দেওয়ার কথা আমার মনে আসেনি।

জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ হীরক খনির মালিক আমি, কারণ নিজের প্রাণ বিপন্ন করে তা আমি আবিষ্কার করেছি। যিনি আমার এ লেখা পড়ে বুঝতে পারবেন, তিনি নিশ্চয়ই সভ্য মানুষ ও খ্রীষ্টান। তাঁর প্রতি আমার অনুরোধ, আমাকে তিনি যেন খ্রীষ্টানের উপযুক্ত কবর দেন। এই অনুগ্রহের বদলে ঐ খনির স্বত্ব আমি তাঁকে দিলাম। রাণী শেবার ধনভাণ্ডারও এ খনির কাছে কিছু নয়।

প্রাণ গেল, যাক্, কি করবো ? কিন্তু কি ভয়ানক মরুভূমি এ ! একটা ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক পর্যন্ত নেই কোনোদিকে ! এমন সব জায়গাও থাকে পৃথিবীতে ! আমার আজ কেবলই মনে হচ্ছে, পপ্‌লার ঘেরা সেরিনো লাগ্রানো হ্রদ আর দেখবো না, তার ধারে যে চতুর্দশ শতাব্দীর গির্জাটা, তার সেই বড় রুপোর ঘণ্টার পবিত্র ধ্বনি, পাহাড়ের ওপরে আমাদের যে প্রাচীন প্রাসাদ কাস্টে-লি রিওলিনি, মুর্‌দের দুর্গের মত দেখায়....দূরে আমব্রিয়ার সবুজ মাঠ ও দ্রাক্ষাক্ষেত্রের মধ্যে দিয়ে ছোট্ট ডোরা নদী বয়ে যাচ্ছে....যাক, আবার কি প্রলাপ বকছি।

গুহার দুয়ারে বসে আকাশের অগণিত তারা প্রাণভরে দেখছি শেষ বারের জন্যে।....সাধু ফ্রাঙ্কোর সেই সৌর স্তোত্র মনে পড়ছে—স্তুত হোন্ প্রভু মোর, পবন সঞ্চার তরে, স্থির বায়ু তরে, ভগিনী মেদিনী তরে, নীল মেঘ তরে, আকাশের তরে, তারকা-সমূহ তরে, সুদিন কুদিন তরে, দেহের মরণ তরে ।

আর একটা কথা। আমার দুই পায়ের জুতোর মধ্যে পাঁচখানা বড় হীরা লুকানো আছে, তোমায় তা দিলাম হে অজানা পথিক বন্ধু। আমার শেষ অনুরোধটি ভুলো না। জননী মেরী তোমার মঙ্গল করুন।

কম্যান্ডার আত্তিলিও গাত্তি
১৮৮০ সাল। সম্ভবতঃ মার্চ মাস।"

* * * *

হতভাগ্য যুবক !

তার মৃত্যুর পরে সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসর চলে গিয়েছে, এই ত্রিশ বৎসরের মধ্যে এ পথে হয়তো কেউ যায়নি, গেলেও গুহাটার মধ্যে ঢোকেনি। এতকাল পরে তার চিঠিখানা মানুষের হাতে পড়ল।

আশ্চর্য এই যে কাঠের পিপেটাতে ত্রিশবছর পরেও জল ছিল কি করে ?

কিন্তু কাগজখানা পড়েই শঙ্করের মনে হল, এই লেখায় বর্ণিত ঐটেই সেই গুহা—সে নিজে যেখানে পথ হারিয়ে মারা যেতে বসেছিল ! তার পরে সে কৌতূহলের সঙ্গে কঙ্কালের পায়ের জুতো টান দিয়ে খসাতেই পাঁচখানা বড় বড় পাথর বেরিয়ে পড়ল। এ অবিকল সেই পাথরের নুড়ির মত, যা এক-পকেট কুড়িয়ে অন্ধকারে গুহার মধ্যে সে পথে চিহ্ন করেছিল এবং যার একখানা তার কাছে রয়েছে। এ পাথরের নুড়ি তো রাশি রাশি সে দেখেছে গুহার মধ্যের সেই অন্ধকারময়ী নদীর জলস্রোতের নীচে, তার দুই তীরে ! কে জানতো যে হীরার খনি খুঁজতে সে ও আল্‌ভারেজ সাতসমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে এসে, ছ'মাস ধরে রিখ্‌টারস্‌ভেল্ড পার্বত্য অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে হয়রান হয়ে গিয়েছে—এমন সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে সে সেখানে গিয়ে পড়বে। হীরা যে এমন রাশি রাশি পড়ে থাকে পাথরের নুড়ির মত—তাই বা কে ভেবেছিল ! আগে এসব জানা থাকলে পাথরের নুড়ি সে দু-পকেট ভরে কুড়িয়ে বাইরে নিয়ে আসতো !

কিন্তু তার চেয়েও খারাপ কাজ হয়ে গিয়েছে যে সে রত্নখনির গুহা যে কোথায়, কোন্ দিকে তার কোনো নক্সা করে আনেনি বা সেখানে কোনো চিহ্ন রেখে আসেনি, যাতে আবার তাকে খুঁজে নেওয়া যেতে পারে। সেই সুবিস্তীর্ণ পর্বত ও অরণ্য অঞ্চলের কোন্ জায়গায় সেই গুহাটা দৈবাৎ সে দেখেছিল, তা কি তার ঠিক আছে, না ভবিষ্যতে সে আবার সে জায়গা বার করতে পারবে ? এ যুবকও তো কোনো নক্সা করেনি, কিন্তু এ সাংঘাতিক আহত হয়েছিল রত্নখনি আবিষ্কার করার পরেই, এর ভুল হওয়া খুব স্বাভাবিক। হয়তো এ যা বার করতে পারতো নক্সা না দেখে—সে তা পারবে না।

হঠাৎ আল্‌ভারেজের মৃত্যুর পূর্বের কথা শঙ্করের মনে পড়ল। সে বলেছিল—চলো যাই, শঙ্কর, গুহার মধ্যে রাজার ভাণ্ডার লুকোনো আছে। তুমি দেখতে পাচ্ছ না, আমি দেখতে পাচ্ছি ।

শঙ্কর তার পরে গুহার মধ্যেই নরকঙ্কালটা সমাধিস্থ করলে। পিপেটা ভেঙে ফেলে তারই দু-খানা কাঠে মরচে-পড়া পেরেক ঠুকে ক্রুশ তৈরী করলে ও সমাধির ওপর সেই ক্রুশটা পুঁতলে। এ ছাড়া খ্রীষ্টধর্মাচারীকে সমাধিস্থ করবার অন্য কোনো রীতি তার জানা নেই। তার পরে সে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলে এই মৃত যুবকের আত্মার শান্তির জন্য।

এসব শেষ করতে সারাদিনটা কেটে গেল। রাত্রে বিশ্রাম করে পরদিন আবার সে রওনা হল। কঙ্কালের চিঠিখানা ও হীরাগুলি যত্ন করে সঙ্গে নিল।

তবে তার মনে হয়, ও অভিশপ্ত হীরার খনির সন্ধানে যে গিয়েছে সে আর ফেরেনি, আত্তিলিও গাত্তি ও তার সঙ্গীরা মরেছে, জিম কার্টার মরেছে, আল্‌ভারেজ মরেছে। এর আগেই বা কত লোক মরেছে, তার ঠিক কি ? এইবার তার পালা। এই মরুভূমিতেই তার শেষ এই বীর ইটালিয়ান যুবকের মত।

তেরো

দুপুরের রোদে যখন দিকে দিগন্তে আগুন জ্বলে উঠল, একটা ছোট্ট পাথরের ঢিবির আড়ালে সে আশ্রয় নিলে। ১৩৫ ডিগ্রী উত্তাপ উঠেছে তাপমান যন্ত্রে, রক্তমাংসের মানুষের পক্ষে এ উত্তাপে পথ হাঁটা চলে না। যদি সে কোন রকমে এই ভয়ানক মরুভূমির হাত এড়াতে পারতো, তবে হয়তো জীবন্ত অবস্থায় মানুষের আবাসে পৌঁছুতেও পারতো। সে ভয় করে শুধু এই মরভূমি, সে জানে কালাহারি মরু বড় বড় সিংহের বিচরণভূমি, কিন্তু তার হাতে রাইফেল আছে—রাতদুপুরেও একা যত সিংহই হোক, সম্মুখীন হতে সে ভয় করে না—কিন্তু ভয় হয় তৃষ্ণা-রাক্ষসীকে। তার হাত থেকে পরিত্রাণ নেই। দুপুরে সে দু-বার মরীচিকা দেখলে। এতদিন মরুপথে আসতেও এ আশ্চর্য নৈসর্গিক দৃশ্য দেখেনি, বইয়েই পড়েছিল মরীচিকার কথা। একবার উত্তর-পূর্ব কোণে, একবার দক্ষিণ-পূর্ব কোণে, দুই মরীচিকাই কিন্তু প্রায় এক রকম—অর্থাৎ একটা বড় গম্বুজওয়ালা মসজিদ বা গির্জা, চারিপাশে খর্জুরকুঞ্জ, সামনে বিস্তৃত জলাশয়। উত্তর-পূর্ব কোণের মরীচিকাটা বেশী স্পষ্ট।

সন্ধ্যার দিকে দূরদিগন্তে মেঘমালার মত পর্বতমালা দেখা গেল। শঙ্কর নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলে না। পূর্বদিকে একটাই মাত্র বড় পর্বত এখান থেকে দেখা পাওয়া সম্ভব, দক্ষিণ রোডেসিয়ার প্রান্তবর্তী চিমানিমানি পর্বতমালা। তাহলে কি বুঝতে হবে যে, সে বিশাল কালাহারি পদব্রজে পার হয়ে প্রায় শেষ করতে চলেছে ! না ও-ও মরীচিকা ?

কিন্তু রাত দশটা পর্যন্ত পথ চলেও জ্যোৎস্নারাত্রে সে দূর-পর্বতের সীমারেখা তেমনি স্পষ্ট দেখতে পেল। অসংখ্য ধন্যবাদ হে ভগবান, মরীচিকা নয় তবে। জ্যোৎস্নারাত্রে কেউ কখনো মরীচিকা দেখেনি।

তবে কি প্রাণের আশা আছে ? আজ পৃথিবীর বৃহত্তম রত্নখনির মালিক সে। নিজের পরিশ্রমে ও দুঃসাহসের বলে সে তার স্বত্ব অর্জন করেছে। দরিদ্র বাংলা মায়ের বুকে সে যদি আজ বেঁচে ফেরে ।

দু'দিনের দিন বিকালে সে এসে পর্বতের নীচে পৌঁছুলো। তখন সে দেখলে, পর্বত পার হওয়া ছাড়া ওপারে যাওয়ার কোনো সহজ উপায় নেই। নইলে পঁচিশ মাইল মরুভূমিতে পাড়ি দিয়ে পর্বতের দক্ষিণ প্রান্ত ঘুরে আসতে হবে। মরুভূমির মধ্যে সে আর কিছুতেই যেতে রাজি নয়। সে পাহাড় পার হয়েই যাবে।

এইখানে সে প্রকাণ্ড একটা ভুল করলে । সে ভুলে গেল যে সাড়ে বারো হাজার ফুট একটা পর্বতমালা ডিঙিয়ে ওপারে যাওয়া সহজ ব্যাপার নয়। রিখ্‌টারস্‌ভেল্ড পার হওয়ার মতই শক্ত। তার চেয়েও শক্ত, কারণ সেখানে আল্‌ভারেজ ছিল, এখানে সে একা।

শঙ্কর ব্যাপারের গুরুত্বটা বুঝতে পারলে না, ফলে চিমানিমানি পর্বত উত্তীর্ণ হতে গিয়ে প্রাণ হারাতে বসলো, ভীষণ প্রজ্বলন্ত কালাহারি পার হতে গিয়েও সে এমন ভাবে নিশ্চিত মৃত্যুর সম্মুখীন হয়নি।

চিমানিমানি পর্বতের জঙ্গল খুব বেশী ঘন নয়। শঙ্কর প্রথম দিন অনেকটা উঠল—তার পর একটা জায়গায় গিয়ে পড়ল, সেখান থেকে কোনদিকে যাবার উপায় নেই। কোন্ পথটা দিয়ে উঠেছিল সেটাও আর খুঁজে পেলে না—তার মনে হল, সে সমতলভূমির যে জায়গা দিয়ে উঠেছিল, তার ত্রিশ ডিগ্রী দক্ষিণে চলে এসেছে। কেন যে এমন হল, এর কারণ কিছুতেই সে বার করতে পারলে না। কোথা দিয়ে কোথায় চলে গেল, কখনও উঠছে, কখনও নামছে, সূর্য দেখে ঠিক করে নিচ্ছে, কিন্তু সাত-আট মাইল পাহাড় উত্তীর্ণ হতে এতদিন লাগছে কেন ?

তৃতীয়দিনে আর একটা নতুন বিপদ ঘটল। তার আগের দিন একখানা আলগা পাথর গড়িয়ে তার পায়ে চোট লেগেছিল। তখন তত কিছু হয়নি, পরদিন সকালে আর সে শয্যা ছেড়ে উঠতে পারে না। হাঁটু ফুলেছে, বেদনাও খুব। দুর্গম পথে নামা-ওঠা করা এ অবস্থায় অসম্ভব। পাহাড়ের একটা ঝরনা থেকে ওঠবার সময় জল সংগ্রহ করে এনেছিল, তাই একটু একটু করে খেয়ে চালাচ্ছে। পায়ের বেদনা কমে না যাওয়া পর্যন্ত তাকে এখানেই অপেক্ষা করতে হবে। বেশীদূর যাওয়া চলবে না। সামান্য একটু-আধটু চলাফেরা করতেই হবে খাদ্য ও জলের চেষ্টায়, ভাগ্যে পাহাড়ের এই স্থানটা যেন খানিকটা সমতলভূমির মত, তাই রক্ষা।

এই সব অবস্থায়, এই মনুষ্যবাসহীন পাহাড়ে বিপদ তো পদে পদেই। একা এ পাহাড় টপকাতে গেলে যে কোনো ইউরোপীয় পর্যটকেরও ঠিক এই রকম বিপদ ঘটতে পারতো।

শঙ্কর আর পারে না। ওর হৃৎপিণ্ডে কি একটা রোগ হয়েছে, একটু হাঁটলেই ধড়াস্ ধড়াস্ করে হৃৎপিণ্ডটা পাঁজরায় ধাক্কা মারে। অমানুষিক পথশ্রমে, দুর্ভাবনায় অখাদ্য কুখাদ্য খেয়ে, কখনও বা অনাহারের কষ্টে, ওর শরীরে কিছু নেই।

চারদিনের দিন সন্ধ্যাবেলা অবসন্ন দেহে সে একটা গাছের তলায় আশ্রয় নিলে। খাদ্য নেই কাল থেকে। রাইফেল সঙ্গে আছে, কিন্তু একটা বন্য জন্তুর দেখা নেই। দুপুরে একটা হরিণকে চরতে দেখে ভরসা হয়েছিল, কিন্তু রাইফেলটা তখন ছিল পঞ্চাশ গজ তফাতে একটা গাছে ঠেস দেওয়া, আনতে গিয়ে হরিণটা পালিয়ে গেল। জল খুব সামান্যই আছে চামড়ার বোতলে। এ অবস্থায় নেমে সে ঝরনা থেকে জল আনবেই বা কি করে ? হাঁটুটা আরও ফুলেছে। বেদনা এত বেশী যে একটু চলাফেরা করলেই মাথার শির পর্যন্ত ছিঁড়ে পড়ে যন্ত্রণায়।

পরিষ্কার আকাশতলে আর্দ্রতাশূন্য বায়ুমণ্ডলের গুণে অনেকদূর পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। দিক্‌চক্রবালে মেঘলা করে ঘিরেছে নীল পর্বতমালা দূরে দূরে। দক্ষিণ-পশ্চিমে দিগন্ত-বিস্তীর্ণ কালাহারি। দক্ষিণে ওয়াহকুহকু পর্বত, তারও অনেক পেছনে মেঘের মত দৃশ্যমান পল ক্রুগার পর্বতমালা—সল্‌স্‌বেরির দিকে কিছু দেখা যায় না, চিমানিমানি পর্বতের এক উচ্চতর শৃঙ্গ সেদিকে দৃষ্টি আটকেছে।

আজ দুপুর থেকে ওর মাথার ওপর শকুনির দল উড়েছে। এতদিন এত বিপদেও শঙ্করের যা হয়নি, আজ শকুনির দল মাথার ওপর উড়তে দেখে শঙ্করের সত্যই ভয় হয়েছে। ওরা তাহলে কি বুঝেছে যে শিকার জোটবার বেশী দেরি নেই ?

সন্ধ্যার কিছু পরে কি একটা শব্দ শুনে চেয়ে দেখলে, পাশের শিলাখণ্ডের আড়ালে একটা ধূসর রঙের নেকড়ে বাঘ—নেকড়ের লম্বা ছুঁচালো কান দুটো খাড়া হয়ে আছে, সাদা সাদা দাঁতের ওপর দিয়ে রাঙা জিবটা অনেকখানি বার হয়ে লক্ লক্ করছে। চোখে চোখ পড়তেই সেটা চট্ করে পাথরের আড়াল থেকে সরে দূরে পালালো।

নেকড়ে বাঘটাও তাহলে কি বুঝেছে ? পশুরা নাকি আগে থেকে অনেক কথা জানতে পারে।

হাড়ভাঙা শীত পড়লো রাত্রে। ও কিছু কাঠকুঠো কুড়িয়ে আগুন জ্বাললে। অগ্নিকুণ্ডের আলো যতটুকু পড়েছে তার বাইরে ঘন অন্ধকার।

কি একটা জন্তু এসে অগ্নিকুণ্ড থেকে কিছু দূরে অন্ধকারে দেহ মিশিয়ে চুপ করে বসলো। কোয়োট্ বন্যকুকুর জাতীয় জন্তু। ক্রমে আর একটা, আর দুটো, আর তিনটে। রাত বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে দশ-পনেরোটা এসে জমা হল। অন্ধকারে তার চারিধার ঘিরে নিঃশব্দে অসীম ধৈর্যের সঙ্গে যেন কিসের প্রতীক্ষা করছে।

কি সব অমঙ্গলজনক দৃশ্য !

ভয়ে ওর গায়ের রক্ত হিম হয়ে গেল। সত্যিই কি এতদিনে তারও মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে !

এতদিন পরে এল তা হলে ! সে-ও পারলে না রিখ্‌টারস্‌ভেল্ড থেকে হীরে নিয়ে পালিয়ে যেতে !

উঃ, আজ কত টাকার মালিক সে ! হীরের খনি বাদ যাক্, তার সঙ্গে যে ছ'খানা হীরে রয়েছে, তার দাম অন্ততঃ দু-তিন লাখ টাকা নিশ্চয় হবে। তার গরীব গ্রামে, গরীব বাপমায়ের বাড়ি যদি এই টাকা নিয়ে গিয়ে উঠতে পারতো....কত গরীবের চোখের জল মুছিয়ে দিতে পারতো, গ্রামে কত দরিদ্র কুমারীকে বিবাহের যৌতুক দিয়ে ভাল পাত্রে বিবাহ দিত, কত সহায়হীন বৃদ্ধ-বৃদ্ধার শেষ দিন ক'টা নিশ্চিন্ত করে তুলতে পারতো....

কিন্তু সে-সব ভেবে কি হবে, যা হবার নয় ? তার চেয়ে এই অপূর্ব রাত্রির নক্ষত্রালোকিত আকাশের শোভা, এই বিশাল পর্বত ও মরুভূমির নিস্তব্ধ গম্ভীর রূপ মৃত্যুর আগে শঙ্করও চায় চোখ ভরে দেখতে, সেই ইটালিয়ান যুবক গাত্তির মত। ওরা যে অদৃষ্টের এক অদৃশ্য তারে গাঁথা সবাই, আত্তিলিও গাত্তি ও তার সঙ্গীরা, জিম কার্টার, আল্‌ভারেজ, সে....

রাত গভীর হয়েছে। কি ভীষণ শীত !....একবার সে চেয়ে দেখলে, কোয়োট্‌গুলো এরই মধ্যে কখন আরও নিকটে সরে এসেছে। অন্ধকারের মধ্যে আলো পড়ে তাদের চোখগুলো জ্বলছে। শঙ্কর একখানা জ্বলন্ত কাঠ ছুঁড়ে মারতেই ওরা সব দূরে সরে গেল—কিন্তু কি নিঃশব্দ ওদের গতিবিধি আর কি অসীম তাদের ধৈর্যও ! শঙ্করের মনে হল, ওরা জানে শিকার ওদের হাতের মুঠোয়, হাতছাড়া হবার কোনো উপায় নেই।

ইতিমধ্যে সন্ধ্যাবেলায় সেই ধূসর নেকড়ে বাঘটাও দু-দু'বার এসে কোয়োট্‌দের পেছনে অন্ধকারে বসে দেখে গিয়েছে।

একটুও ঘুমুতে ভরসা হল না ওর। কি জানি কোয়োট্ আর নেকড়ের দল হয়তো তা হলে জীবন্তই তাকে ছিঁড়ে খাবে মৃত মনে করে। অবসন্ন ক্লান্ত দেহে জেগেই বসে থাকতে হবে তাকে। ঘুমে চোখ ঢুলে আসলেও

উপায় নেই। মাঝে মাঝে কোয়োট্‌গুলো এগিয়ে এসে বসে, ও জ্বলন্ত কাঠ ছুঁড়ে মারতেই সরে যায়....দু-একটা হায়েনাও এসে ওদের দলে যোগ দিলে....হায়েনাদের চোখগুলো অন্ধকারে কি ভীষণ জ্বলছে।

কি ভয়ানক অবস্থাতে পড়েছে। জনবিরল বর্বর দেশের জনশূন্য পর্বতের সাড়ে তিন হাজার ফুট উপরে সে চলৎশক্তিহীন অবস্থায় বসে....গভীর রাত, ঘোর অন্ধকার...সামান্য আগুন জ্বলছে....মাথার ওপর জলকণাশূন্য স্তব্ধ বায়ুমণ্ডলের গুণে আকাশের অগণ্য তারা জ্বল্ জ্বল্ করছে যেন ইলেকট্রিক আলোর মত....নীচে তার চারিধার ঘিরে অন্ধকারে মাংসলোলুপ নীরব কোয়োট্, হায়েনার দল।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার এটাও মনে হল, বাংলার পাড়াগাঁয়ে ম্যালেরিয়ায় ধুঁকে সে মরছে না। এ মৃত্যু বীরের মৃত্যু। পদব্রজে কালাহারি মরুভূমি পার হয়েছে সে-একা। মরে গিয়ে চিমানিমানি পর্বতের শিলায় নাম খুদে রেখে যাবে। সে একজন বিশিষ্ট ভ্রমণকারী ও আবিষ্কারক। অত বড় হীরের খনি সেই তো খুঁজে বার করেছে ! আল্‌ভারেজ মারা যাওয়ার পরে সেই বিশাল অরণ্য ও পর্বত অঞ্চলের গোলকধাঁধা থেকে তো সে একাই বার হতে পেরে এতদূর এসেছে। এখন সে নিরুপায়, অসুস্থ, চলৎশক্তি-রহিত। তবুও সে যুঝছে, ভয় তো পায়নি, সাহস তো হারায়নি। কাপুরুষ, ভীরু নয় সে। জীবন-মৃত্যু তো অদৃষ্টের খেলা। না বাঁচলে আর তার দোষ কি ?

* * * *

দীর্ঘ রাত্রি কেটে গিয়ে পুবদিকে ফরসা হল। সঙ্গে সঙ্গে বন্য জন্তুর দল কোথায় পালালো। বেলা বাড়ছে, আবার নির্মম সূর্য জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিতে শুরু করছে দিক্‌বিদিক্। সঙ্গে সঙ্গে শকুনির দল কোথা থেকে এসে হাজির। কেউ মাথার ওপর ঘুরছে, কেউ বা দূরে দূরে গাছের ডালে কি পাথরের ওপরে বসেছে। খুব ধীরভাবে প্রতীক্ষা করছে। ওরা যেন বলছে—কোথায় যাবে বাছাধন? যে ক'দিন লাফালাফি করবে করে নাও, আমরা বসি, এমন কিছু তাড়াতাড়ি নেই আমাদের।

শঙ্করের খিদে নেই। খাবার ইচ্ছেও নেই। তবুও সে গুলি করে একটা শকুনি মারলে। রৌদ্র ভীষণ চড়েছে। আগুন-তাতা পাথরের গায়ে পা রাখা যায় না ! এ পর্বতও মরুভূমির শামিল, খাদ্য এখানে মেলে না, জলও না। সে মরা শকুনিটা নিয়ে আগুন জ্বেলে ঝলসাতে বসলো। এর আগে মরুভূমির মধ্যে সে শকুনির মাংস খেয়েছে। এরাই এখন প্রাণধারণের একমাত্র উপায়, আজ ও খাচ্ছে ওদের, কাল ওরা খাবে ওকে। শকুনিগুলো এসে আবার মাথার ওপর জুটেছে।

তার নিজের ছায়া পড়েছে পাথরের গায়ে, সে নির্জন স্থানে শঙ্করের উদ্‌ভ্রান্ত মনে ছায়াটা যেন আর একজন সঙ্গী মনে হল। বোধ হয় ওর মাথা খারাপ হয়ে আসছে....কারণ বেঘোর অবস্থায় ও কতবার নিজের ছায়ার সঙ্গে কথা বলতে লাগল....কতবার পরক্ষণের সচেতন মুহূর্তে নিজের ভুল বুঝে নিজেকে সামলে নিলে।

সে পাগল হয়ে যাচ্ছে নাকি জ্বর হয়নি তো?....তার মাথার মধ্যে ক্রমশঃ গোলমাল হয়ে যাচ্ছে সব। আল্‌ভারেজ...হীরের খনি....পাহাড়, পাহাড়, বালির সমুদ্র....আত্তিলিও গাত্তি,...কাল রাত্রে ঘুম হয়নি....আবার রাত আসছে, সে একটু ঘুমিয়ে নেবে।

কিসের শব্দে ওর তন্দ্রা ছুটে গেল। একটা অদ্ভুত ধরনের শব্দ আসছে কোন্ দিক থেকে ? কোন পরিচিত শব্দের মত নয়। কিসের শব্দ ? কোন্ দিক থেকে শব্দটা আসছে তাও বোঝ যায় না। কিন্তু ক্রমশঃ কাছে আসছে সেটা।

হঠাৎ আকাশের দিকে শঙ্করের চোখ পড়তেই সে অবাক হয়ে চেয়ে রইল...তার মাথার ওপর দিয়ে আকাশের পথে বিকট শব্দ করে কি একটা জিনিস যাচ্ছে। ওই কি এরোপ্লেন ? সে বইয়ে ছবি দেখেছে বটে।

এরোপ্লেন যখন ঠিক মাথার ওপর এল, শঙ্কর চীৎকার করলে, কাপড় ওড়ালে, গাছের ডাল ভেঙে নাড়লে, কিন্তু কিছুতেই পাইলটের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারলে না। দেখতে দেখতে এরোপ্লেনখানা সুদূরে ভায়োলেট রঙের পল্ ক্রুগার পর্বতমালার মাথার ওপর অদৃশ্য হয়ে গেল।

হয়তো আরও এরোপ্লেন যাবে এ পথ দিয়ে। কি আশ্চর্য দেখতে এরোপ্লেন জিনিসটা। ভারতবর্ষে থাকতে সে একখানাও দেখেনি।

শঙ্কর ভাবলে, আগুন জ্বালিয়ে কাঁচা ডালপাতা দিয়ে সে যথেষ্ট ধোঁয়া করবে। যদি আবার এ পথে যায়, পাইলটের দৃষ্টি আকৃষ্ট হবে ধোঁয়া দেখে। একটা সুবিধে হয়েছে, এরোপ্লেনের বিকট আওয়াজে শকুনির দল কোন্ দিকে ভেগেছে।

সেদিন কাটল। দিন কেটে রাত্রি হবার সঙ্গে সঙ্গে শঙ্করের দুর্ভোগ হল শুরু। আবার গত রাত্রির পুনরাবৃত্তি। সেই কোয়োটের দল আবার এল। আগুনের চারিধারে তারা আবার তাকে ঘিরে বসলো। নেকড়ে বাঘটা সন্ধ্যা না হতেই দূর থেকে একবার দেখে গেল। গভীর রাত্রে আর একবার এল।

কিসে এদের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়? আওয়াজ করতে ভরসা হয় না—টোটা মাত্র দুটি বাকী। টোটা ফুরিয়ে গেলে তাকে অনাহারে মরতে হবে। মরতে তো হবেই, তবে দু'দিন আগে আর পিছে ; যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ।

কিন্তু আওয়াজ তাকে করতেই হল। গভীর রাত্রে হায়েনাগুলো এসে কোয়োট্‌দের সাহস বাড়িয়ে দিলে। তারা আরও এগিয়ে সরে এসে তাকে চারিধার থেকে ঘিরলে। পোড়া কাঠ ছুঁড়ে মারলে আর ভয় পায় না।

একবার একটু তন্দ্রামত এসেছিল—বসে বসেই ঢুলে পড়েছিল। পরমুহূর্তে সজাগ হয়ে উঠে দেখলে, নেকড়ে বাঘটা অন্ধকার থেকে পা টিপে টিপে তার অত্যন্ত কাছে এসে পড়েছে। ওর ভয় হল ; হয়তো ওটা ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে। ভয়ের চোটে একবার গুলি ছুঁড়লে। আর একবার শেষ রাতের দিকে ঠিক এ রকমই হল। কোয়োট্‌গুলোর ধৈর্য অসীম, সেগুলো চুপ করে বসে থাকে মাত্র, কিছু বলে না। কিন্তু নেকড়ে বাঘটা ফাঁক খুঁজছে।

রাত ফরসা হবার সঙ্গে সঙ্গে দুঃস্বপ্নের মত অন্তর্হিত হয়ে গেল কোয়োট্, হায়েনা ও নেকড়ের দল। সঙ্গে সঙ্গে শঙ্করও আগুনের ধারে শুয়েই ঘুমিয়ে পড়ল।

একটা কিসের শব্দে শঙ্করের ঘুম ভেঙে গেল।

খানিকটা আগে খুব বড় একটা আওয়াজ হয়েছে কোনো কিছুর। শঙ্করের কানে তার রেশ এখনও লেগে আছে।

কেউ কি বন্দুকের আওয়াজ করেছে ? কিন্তু তা অসম্ভব। এই দুর্গম পর্বতের পথে কোন্ মানুষ আসবে ?

একটিমাত্র টোটা অবশিষ্ট আছে। শঙ্কর ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে সেটা খরচ করে একটা আওয়াজ করলে। যা থাকে কপালে, মরেছেই তো। উত্তরে দু-বার বন্দুকের আওয়াজ হল।

আনন্দে ও উত্তেজনায় শঙ্কর ভুলে গেল যে তার পা খোঁড়া, ভুলে গেল যে সে একটানা বেশীদূর যেতে পারে না। তার আর টোটা নেই—সে আর বন্দুকের আওয়াজ করতে পারলে না—কিন্তু প্রাণপণে চীৎকার করতে লাগল, গাছের ডাল ভেঙে নাড়তে লাগল, আগুন জ্বালাবার কাঠকুটোর সন্ধানে চারিদিকে আকুল দৃষ্টিতে চেয়ে দেখতে লাগল।

* * * *

ক্রুগার ন্যাশান্যাল পার্ক জরীপ করবার দল কিম্বার্লি থেকে কেপটাউন যাবার পথে চিমানিমানি পর্বতের নীচে কালাহারি মরুভূমির উত্তর-পূর্ব কোণে তাঁবু ফেলেছিল। সঙ্গে সাতখানা ডবল টায়ার ক্যাটারপিলার চাকা বসানো মোটর গাড়ি। এদের দলে নিগ্রো কুলী ও চাকর-বাকর বাদে ন'জন ইউরোপীয়। জনচারেক হরিণ শিকার করতে উঠেছিল চিমানিমানি পর্বতের প্রথম ও নিম্নতম থাকটাতে।

হঠাৎ এ জনহীন অরণ্যপ্রদেশে সভ্য রাইফেলের আওয়াজে ওরা বিস্মিত হয়ে উঠল। কিন্তু ওদের পুনরায় আওয়াজের প্রত্যুত্তর না পেয়ে ইতস্ততঃ খুঁজতে বেরিয়ে দেখতে পেলে সামনের একটা অপেক্ষাকৃত উচ্চতর চূড়া থেকে, এক জীর্ণ ও কঙ্কালসার কোটরগতচক্ষু প্রেতমূর্তি উন্মাদের মত হাত পা নেড়ে তাদের কি বোঝাবার চেষ্টা করছে। তার পরনে ছিন্নভিন্ন অতি মলিন ইউরোপীয় পরিচ্ছদ।

ওরা ছুটে গেল। শঙ্কর আবোল-তাবোল কি বকলে, ওরা ভাল বুঝতে পারলে না।। যত্ন করে ওকে নামিয়ে পাহাড়ের নীচে ওদের ক্যাম্পে নিয়ে গেল। ওর জিনিসপত্রও নামিয়ে আনা হয়েছিল। তখন ওকে বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হল।

কিন্তু এই ধাক্কায় শঙ্করকে বেশ ভুগতে হল। ক্রমাগত অনাহারে, কষ্টে, উদ্বেগে, অখাদ্য কুখাদ্য ভক্ষণের ফলে তার শরীর খুব জখম হয়েছিল—সেই রাত্রেই তার বেজায় জ্বর এল।

* * * *

জ্বরে সে অঘোর অচৈতন্য হয়ে পড়ল—কখন যে মোটর গাড়ী ওখান থেকে ছাড়লো, কখন যে তারা সল্‌স্‌বেরিতে পৌঁছলো শঙ্করের কিছুই খেয়াল নেই। সেই অবস্থায় পনেরো দিন সে সল্‌স্‌বেরির হাসপাতালে কাটিয়ে দিলে। তার পর ক্রমশঃ সুস্থ হয়ে মাসখানেক পরে একদিন সকালে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে বাইরের রাজপথে এসে দাঁড়ালো।

চোদ্দ

সল্‌স্‌বেরি ! কত দিনের স্বপ্ন !...

আজ সে সত্যিই একটা বড় ইউরোপীয় ধরনের শহরের ফুটপাথে দাঁড়িয়ে। বড় বড় বাড়ী, ব্যাঙ্ক, হোটেল, দোকান, পিচঢালা চওড়া রাস্তা, একপাশ দিয়ে ইলেকট্রিক ট্রাম চলেছে, জুলু রিক্‌শাওয়ালা রিক্‌শা টানছে, কাগজওয়ালা কাগজ বিক্রী করছে। সবই যেন নতুন, যেন এসব দৃশ্য জীবনে কখনো দেখেনি।

লোকালয়ে তো এসেছে, কিন্তু সে একেবারে কপর্দকশূন্য। এক পেয়ালা চা খাবার পয়সাও তার নেই। কাছে একটা ভারতীয় দোকান দেখে তার বড় আনন্দ হল। কতদিন যে দেখেনি স্বদেশবাসীর মুখ ! দোকানদার মেমন্‌ মুসলমান, সাবান ও গন্ধদ্রব্যের পাইকারী বিক্রেতা। খুব বড় দোকান। শঙ্করকে দেখেই সে বুঝলে এ দুঃস্থ ও বিপদগ্রস্ত। নিজে দু টাকা সাহায্য করলে ও একজন ভারতীয় সওদাগরের সঙ্গে দেখা করতে বলে দিলে।

টাকা দুটি পকেটে নিয়ে শঙ্কর আবার পথে এসে দাঁড়ালো। আসবার সময় বলে এল—অসীম ধন্যবাদ টাকা দুটির জন্যে, এ আমি আপনার কাছে ধার নিলাম, আমার হাতে পয়সা এলে আপনাকে কিন্তু এ টাকা নিতে হবে। সামনেই একটা ভারতীয় রেস্টুরেন্ট। সে ভাল কিছু খাবার লোভ সম্বরণ করতে পারলে না। কতদিন সভ্য খাদ্য মুখে দেয়নি। সেখানে ঢুকে এক টাকায় পুরী, কচুরী, হালুয়া, মাংসের চপ পেট ভরে খেলে। সেই সঙ্গে দু-তিন পেয়ালা কফি।

চায়ের টেবিলে একখানা পুরোনো খবরের কাগজের দিকে তার নজর পড়ল। তাতে একটা জায়গায় বড় বড় অক্ষরের হেডলাইনে লেখা আছে—

National Park Survey Party's Singular Experience
A lonely Indian found in the desert
Dying of thirst and Exhaustion
His strange story

শঙ্কর দেখলে, তার একটা ফটোও কাগজে ছাপা হয়েছে। তার মুখে একটা সম্পূর্ণ কাল্পনিক গল্পও দেওয়া হয়েছে। এরকম গল্প সে কারো কাছে করেনি।

খবরের কাগজখানার নাম 'সল্‌স্‌বেরি ডেলি ক্রনিক্‌ল্‌। সে খবরের কাগজের অফিসে গিয়ে নিজের পরিচয় দিলে। তার চারিপাশে ভিড় জমে গেল। ওকে খুঁজে বার করবার জন্যে রিপোর্টারের দল অনেক চেষ্টা করেছিল জানা গেল। সেখানে চিমানিমানি পর্বতে পা ভেঙে পড়ে থাকার গল্প বলে ও ফটো তুলতে দিয়ে শঙ্কর পঞ্চাশ টাকা পেলে। ও থেকে সে আগে সেই সহৃদয় মুসলমান দোকানদারের টাকা দুটি দিয়ে এল।

ওদের দৃষ্ট আগ্নেয়গিরিটার সম্বন্ধে সে কাগজে একটা প্রবন্ধ লিখলে। তাতে আগ্নেয়গিরিটারও নামকরণ করলে মাউন্ট আল্‌ভারেজ। তবে মধ্য-আফ্রিকার অরণ্যে লুকানো একটা এত বড় আস্ত জীবন্ত আগ্নেয়গিরির এই গল্প কেউ বিশ্বাস করলে, কেউ করলে না। অবিশ্যি রত্নের গুহার বাষ্পও সে কাউকে জানতে দেয়নি। দলে দলে লোক ছুটবে ওর সন্ধানে।

তার পরে একটা বইয়ের দোকানে গিয়ে সে একরাশ ইংরেজি বই ও মাসিক পত্রিকা কিনলে। বই পড়েনি কতকাল ! সন্ধ্যায় একটা সিনেমায় ছবি দেখলে। কতকাল পরে রাত্রে হোটেলের ভাল বিছানায় ইলেকট্রিক আলোর তলায় শুয়ে বই পড়তে পড়তে সে মাঝে মাঝে জানালা দিয়ে নীচের প্রিন্স আলবার্ট ভিক্টর স্ট্রীটের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছিল। ট্রাম যাচ্ছে। নীচে দিয়ে, জুলু রিক্‌শাওয়ালা রিক্‌শা চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, ভারতীয় কফিখানায় ঠুন্‌ ঠুন্‌ করে ঘণ্টা বাজছে, মাঝে মাঝে দু-চারখানা মোটরও যাচ্ছে।....এর সঙ্গে মনে হল আর একটা ছবি—সামনে আগুনের কুণ্ড, কিছুদূরে বৃত্তাকারে ঘিরে বসে আছে কোয়োট্‌ ও হায়েনার দল। ওদের পিছনে নেকড়েটার দুটো গোল গোল চোখ আগুনের ভাঁটার মত জ্বলছে অন্ধকারের মধ্যে।

কোন্‌টা স্বপ্ন ?....চিমানিমানি পর্বতে যাপিত সেই ভয়ঙ্কর রাত্রি, না আজকের এই রাত্রি ?

ইতিমধ্যে সল্‌স্‌বেরিতে সে একজন বিখ্যাত লোক হয়ে গেল। রিপোর্টারের ভিড়ে তার হোটেলের হল সব সময় ভর্তি। খবরের কাগজের লোক আসে তার ভ্রমণবৃত্তান্ত ছাপাবার কন্ট্রাক্ট করতে, কেউ আসে ফটো নিতে।

আত্তিলিও গাত্তির কথা সে ইটালিয়ান কনসাল জেনারেলকে জানালে। তাঁর আপিসের পুরোনো কাগজপত্র ঘেঁটে জানা গেল, আত্তিলিও গাত্তি নামে একজন সম্ভ্রান্ত ইটালিয়ান যুবক ১৮৭৯ সালের আগস্ট মাসে পর্তুগীজ

পশ্চিম আফ্রিকার উপকূলে জাহাজডুবি হবার পরে নামে। তার পর যুবকটির আর কোনো পাত্তা পাওয়া যায়নি। তার আত্মীয়-স্বজন ধনী ও সম্ভ্রান্ত লোক। ১৮৯০-৯৫ সাল পর্যন্ত তারা তাদের নিরুদ্দিষ্ট আত্মীয়ের সন্ধানের জন্যে পূর্ব পশ্চিম ও দক্ষিণ আফ্রিকার কনসুলেট আপিসকে জ্বালিয়ে খেয়েছিল, পুরস্কার ঘোষণা করাও হয়েছিল তার সন্ধানের জন্যে। ১৮৯৫ সাল থেকে তারা হাল ছেড়ে দিয়েছিল।

পূর্বোক্ত মুসলমান দোকানদারটির সাহায্যে সে ব্ল্যাকমুন স্ট্রীটের বড় জহুরী রাইডাল ও মর্সবির দোকানে চারখানা পাথর সাড়ে বত্রিশ হাজার টাকায় বিক্রী করলে। বাকী দু-খানার দর আরও বেশী উঠেছিল, কিন্তু শঙ্কর সে দু-খানা পাথর তার মাকে দেখাবার জন্যে দেশে নিয়ে যেতে চায়। এখন বিক্রী করতে তার ইচ্ছে নেই।

* * * *

নীল সমুদ্র !....

বম্বেগামী জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে পর্তুগীজ পূর্ব-আফ্রিকার বেইরা বন্দরের নারিকেল-বনশ্যাম তীরভূমিতে মিলিয়ে যেতে দেখতে দেখতে শঙ্কর ভাবছিল তার জীবনের এই অ্যাডভেঞ্চারের কথা। এই তো জীবন, এই ভাবেই তো জীবনকে ভোগ করতে চেয়েছিল সে। মানুষের আয়ু মানুষের জীবনের ভুল মাপকাঠি। দশ বৎসরের জীবন উপভোগ করেছে সে এই দেড় বছরে। আজ সে শুধু একজন ভবঘুরে পথিক নয়, একটা জীবন্ত আগ্নেয়গিরির সহ-আবিষ্কারক। মাউন্ট আল্‌ভারেজকে সে জগতে প্রসিদ্ধ করবে। দূরে ভারত মহাসমুদ্রের পারে জননী জন্মভূমি পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের জন্য এখন মন তার চঞ্চল হয়ে উঠেছে। তার মনটি উৎসুক হয়ে আছে, কবে দূর থেকে দৃশ্যমান বোম্বাইয়ের রাজাবাই টাওয়ারের উঁচু চুড়োটা মাতৃভূমির উপকূলের সান্নিধ্য ঘোষণা করবে....তার পর বাউলকীর্তনগান-মুখরিত বাংলাদেশের প্রান্তে তাদের শ্যামল ছোট্ট পল্লী....সামনে আসছে বসন্তকাল....পল্লীপথে যখন একদিন সজনে ফুলের দল পথ বিছিয়ে পড়ে থাকবে, বৌ-কথা-ক ডাকবে ওদের বড় বকুল গাছটায়....নদীর ঘাটে গিয়ে লাগবে ওর ডিঙি।

বিদায় আল্‌ভারেজ বন্ধু !....স্বদেশে ফিরে যাওয়ার এই আনন্দের মুহূর্তে তোমার কথাই আজ মনে হচ্ছে। তুমি সেই দলের মানুষ, সারা আকাশ যাদের ঘরের ছাদ, সারা পৃথিবী যাদের পায়ে চলার পথ—আশীর্বাদ কোরো তোমার মহারণ্যের নির্জন সমাধি থেকে, যেন তোমার মত হতে পারি জীবনে, অমনি সুখ-দুঃখে নিস্পৃহ, অমনি নির্ভীক।

বিদায় বন্ধু আত্তিলিও গাত্তি। অনেক জন্মের বন্ধু ছিলে তুমি।

তোমরা সবাই মিলে শিখিয়েছ চীন দেশে প্রচলিত সেই প্রাচীন ছড়াটির সত্যতা-

ছাদের আলসের দিব্যি চৌরস একখানা টালি হয়ে অনড় অবস্থায় সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকার চেয়ে স্ফটিক প্রস্তর হয়ে ভেঙে যাওয়াও ভালো, ভেঙে যাওয়াও ভালো, ভেঙে যাওয়াও ভালো।

* * * *

আবার তাকে আফ্রিকায় ফিরতে হবে। এখন জন্মভূমির টান বড় টান। জন্মভূমির কোলে এখন সে কিছুদিন কাটাবে। তার পর দেশেই সে কোম্পানী গঠন করবার চেষ্টা করবে—আবার সুদূর রিখ্‌টারস্‌ভেল্ড পর্বতে ফিরবে রত্নখনির পুনর্বার অনুসন্ধানে—খুঁজে সে বার করবেই।

ততদিন—বিদায় !